বিশেষ সংখ্যা
মা দিবস, ১০ মে

প্রকাশনার ৮৬ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১৫ ১০ - ১৬ মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

মাতৃদিবস (Mother's Day)

মানবসেবায় ধৈর্যশীল ও নিবেদিত প্রাণ

কি করে তাঁকে ভুলে যাই!

মায়ের শিক্ষা

চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশ
থানচির শান্তি রক্ষাকারিণী মা-মারীয়ার তীর্থোৎসব-২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

শান্তিরাজ কাথলিক ধর্মপল্লী, থানচি, বান্দরবান

তারিখ: ২৮ ও ২৯ মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

মূলভাব: "আমার অন্তর গেয়ে উঠে প্রভুর জয়গান" (লুক: ১:৪৬)

খ্রিস্টেতে প্রিয় ভাই ও বোনেরা, অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আগামী ২৮ ও ২৯ মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, বান্দরবানের থানচিস্থ শান্তিরাজ কাথলিক ধর্মপল্লীতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে "থানচির শান্তি রক্ষাকারিণী মা মারীয়ার মহাতীর্থোৎসব"। এ উৎসবে পর্বদিনের মহাখ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করবেন চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি। তাই আশীর্বাদের এই তীর্থ উৎসবে শান্তি রক্ষাকারিণী মা মারীয়ার স্নেহময় সুরক্ষা ও মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ লাভের এই মহতী সুযোগে, সবুজ পাহাড়ী ঘেরা শান্তিরাজ ধর্মপল্লী থানচিতে আপনাদের সকলকে আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ ও স্বাগতম জানাচ্ছি।

পর্বকর্তা, ও বিশেষ উদ্দেশ্য প্রদানে নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করছি:
ফাদার নিকোলাস নকরেক, সিএসসি: ০১৮৭৬২৩৩১৩১, ফাদার সৈকত বেনেডিক্ট কুলেন্তুনু, সিএসসি: ০১৮৪১৯৯৭৪৫৭
মি. আন্দ্রিয় ত্রিপুরা: ০১৮৫৬৪৭৬১৫০

আয়োজনে: তীর্থোৎসব পরিচালনা কমিটি, শান্তিরাজ ধর্মপল্লী, থানচি, বান্দরবান।

অনুষ্ঠানসূচি

২৮ মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার
সন্ধ্যা ৬:০০ : খ্রিস্টযাগ (পৌরহিত্য: ফাদার টেরেন্স রড্রিক্স ভিকার জেনারেল, চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশ)
রাত ৭:৩০ : রাতের খাবার (নিজ দায়িত্বে কূপনের মাধ্যমে)
রাত ৮:৩০ : আলোকশোভাযাত্রা ও জপমালা প্রার্থনা
রাত ৯:৩০ : নিরাময়কারী অনুষ্ঠান, আরাধনা ও পাপস্বীকার

২৯ মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার
সকাল ৮:০০ : সকালের প্রার্থনা
সকাল ৯:৩০ : তীর্থের মহা খ্রিস্টযাগ (পৌরহিত্য: আর্চবিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার, সিএসসি মহাধর্মপাল, চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশ)
দুপুর ১২:০০ : দুপুরের আহার (নিজ দায়িত্বে কূপনের মাধ্যমে)

বিজ্ঞ/১৯২/২৬

বিদায়ের ১ বছর

আমাদের হৃদয়ে চির ভাস্বর তুমি চিরদিন

প্রয়াত রিপন জেভিয়ার রোজারিও
জন্ম: ১৬ নভেম্বর, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৫ মে, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
পাগাড় ধর্মপল্লী।

দেখতে দেখতে ১টি বছর পার হয়ে গেল। গত বছর ১৫ মে, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে আমাদের পরিবার শূণ্য করে, আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেছো। তোমার অনুপস্থিতি, তোমার চলার প্রতিটি শব্দ, কথা আজও আমাদের কানে বাজে। তখন চোখ জলে ভাসে আর তোমার স্মৃতি। যেখানেই যাই নয়নে ভেসে উঠে তোমার ছবি। বিশ্বাস করি তুমি পরম পিতার শাশ্বত রাজ্যেই আছো। ঈশ্বররের সাথে সুখ ও শান্তিতে বিশ্রাম করো এবং আমাদেরকে আশীর্বাদ দান করো।

যারা আমাদের পরিবারের জন্য প্রার্থনা ও পাশে থেকে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা প্রার্থনা ও শুভেচ্ছা।

তোমারই শোকাহত প্রিয়জনেরা
মা : রিনা রোজারিও
স্ত্রী : দিপালী গমেজ
ছেলে : ধ্রুব রোজারিও
মেয়ে : দোলা রোজারিও

বিজ্ঞ/১৯৩/২৬

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
অর্ঘ্য রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org
মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বর্ষ : ৮৬, সংখ্যা : ১৫
১০ মে - ১৬ মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
২৭ বৈশাখ - ০২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

মা'য়ের ইচ্ছা ও প্রত্যাশাকে মূল্য দিন

মে মাসে খ্রিস্টমণ্ডলী মা মারীয়ার প্রতি বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা জানায়। আবার এ মে মাসের ২য় রবিবারে পালিত হয় 'মা দিবস'। এ বছর তা ১০ মে পালন করা হবে। মা দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো মা'দের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভালোবাসা প্রকাশ করা এবং তাদের অবদান ও আত্মদানকে মর্যাদা দান। শুধুমাত্র নিজের মা-কেই নয় সকল মা-কেই মায়ের মর্যাদা ও সম্মান দান করা এ দিবসের এক বিশেষ আহ্বান। আর সন্তান বা সন্তানতুল্য ব্যক্তিরা এ সম্মান দান করতে পারে মা'য়েদের ইচ্ছা ও প্রত্যাশাকে বাস্তবায়ন করার মধ্যদিয়ে।

মা দিবসের প্রতিষ্ঠালগ্নের ইতিহাসে দেখা মায়ের ত্যাগের সম্মান জানিয়ে আন্না জার্ভিস এ বিশেষ দিবস পালনের উদ্যোগ নেন। সময়ের পরিক্রমায় তার এ শুভ উদ্যোগে অনেকে অংশগ্রহণ করে মা'কে সম্মান জানানোর একটি উপলক্ষ্য সৃষ্টি করে। এইদিনটি বিশেষ কেননা এদিনে পরিবারের চালিকাশক্তি মা'কে বিশেষভাবে সম্মান জানানো হয়। শুধু একদিন নয় প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তেই মা সম্মানীয় ও শ্রদ্ধার। তবে সবসময়ের চুপচাপ ও নীরবে শ্রদ্ধার হয়ে থাকা বিষয়টিকে একদিনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করার মধ্যেও আন্তরিকতা ও আনন্দময়তা রয়েছে।

মায়ের ভালবাসা স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বর্গীয়। জগতের আর কারো কাছ থেকে এই নিঃস্বার্থ ও পবিত্র ভালবাসা আশা করা যায় না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মায়ের এই নিঃস্বার্থ ভালবাসা চলতে থাকে। সন্তানের সুখের জন্য মা নিজের দুঃখ কষ্ট আড়াল করে রাখেন। তিলে তিলে নিজেকে দান করে সন্তানকে বড় করে তোলেন। তাই মানব জীবনে মায়ের স্থান অনেক উর্ধ্বে, সর্বাধিক শ্রদ্ধা ও সম্মানের। মাকে ভালবাসা ও তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের কথাটি পবিত্র ধর্মগুলোতে বেশ গুরুত্ব দিয়ে বলেছে। সনাতন ধর্মের উপনিষদে আছে "মাতৃ দেব ভব" অর্থাৎ মা দেবী স্বরুপিনী, জীবন্ত ঈশ্বরী। ইসলাম ধর্মে 'মায়ের পায়ের নীচে বেহেস্ত' বলে মাকে অতীব মর্যাদা দান করা হয়েছে। আর খ্রিস্টধর্মে মা মারীয়াকে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা জানানো হয়। তাঁকে ঈশ্বরের মাতা বলেও আখ্যায়িত করা হয়। সব ধর্মেই মা আশীর্বাদ স্বরূপ। তাই সন্তানের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে মাকে শ্রদ্ধা করা এবং অন্তরের শ্রেষ্ঠতম স্থানে মাকে প্রতিষ্ঠা করা। সন্তানের হৃদয়োৎসারিত ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় মাকে প্লাবিত করা। মায়ের প্রতি সর্বদা খেয়াল রাখা এবং মায়ের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কাজ করা সন্তানের একটি পবিত্র ও নৈতিক দায়িত্ব। মাকে যারা অবহেলা, অযত্ন করে, যারা খোঁজ-খবর নেয় না, মায়ের প্রয়োজন সম্বন্ধে উদাসীন থাকে; তারা জীবনে কোনদিন সফল ও সুখী হতে পারবে না। ফলশ্রুতিতে প্রত্যেকজন সন্তানের উচিত মাকে ঈশ্বরের মহামূল্যবান উপহার হিসেবে গ্রহণ করা। যেমনটি মা সন্তানকে ঈশ্বরের দান হিসেবে গ্রহণ করে সমস্ত ভালবাসা ও দরদ দিয়ে লালন-পালন করেছেন।

সন্তান তার মাকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারছে কিনা তা আজ বড় প্রশ্ন? আমরা কি কখনও ভেবে দেখেছি, সন্তান ও পরিবারের প্রতি নিরন্তর ভালোবাসা ও যত্নের বিনিময়ে কী পাচ্ছেন মা? আমাদের মধ্যে কতজন পরিবার ও সমাজে মায়েদের অবদানের স্বীকৃতি দিচ্ছি? তাদের শারীরিক ও মানসিক যত্ন নিচ্ছি; তাদের কাছে গিয়ে বসছি-সমস্যার কথা জানতে চেয়েছি, তাদের জড়িয়ে ধরি বলছি - মা তোমাকে ভীষণ ভালবাসি। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, অনেক সন্তানই মা ও মাতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কোন যত্ন নেন না, খোঁজ খবর রাখেন না। কিন্তু মা দিবসে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে "মা আমার পৃথিবী, আমার শ্রেষ্ঠ ভালোবাসা মা, আমার জীবন জুড়েই মা, মা তোমাকে জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসি ইত্যাদি লিখে এবং মায়ের সাথে ছবি পোস্ট দিয়ে ভণ্ডামির ষোলকলা পূরণ করে মানুষের চোখে ভালো সাজার চেষ্টা করেন। এরূপ সন্তানদের একটাই পরামর্শ মায়ের কাছে যান - তাতেই আপনারা পারস্পরিকভাবে সুখ-শান্তি পাবেন।

কাথলিক খ্রিস্টানগণ মা মারীয়ার আশ্রয় নিয়ে জীবনের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত ও সংকটকে মোকাবেলা করে থাকেন। তাই মা মারীয়ার প্রতি তাদের রয়েছে বিশেষ ভক্তি, বিশ্বাস ও ভালোবাসা। কুমারী মারীয়ার প্রতি যেমন ভক্তি-শ্রদ্ধা রয়েছে তেমনি যেনো থাকে নিজেদের মায়ের জন্যও। পৃথিবীর সকল মায়েরা ভালো, সুস্থ ও সম্মানে থাকুন। †

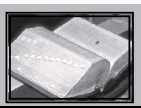

তোমরা যদি আমাকে ভালোবাস, তাহলে আমার আজ্ঞাগুলো পালন করবে। *(যোহন ১৪:১৫)*

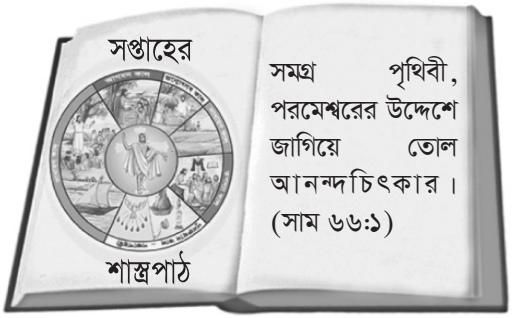

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১০ মে - ১৬ মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

১০ মে, রবিবার
পুনরুত্থানকালের ৬ষ্ঠ রবিবার (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-২)
শিষ্য ৮: ৫-৮, ১৪-১৭, সাম ৬৬: ১-৭, ১৬, ২০, ১ পিত ৩: ১৫-১৮, যোহন ১৪: ১৫-২১

১১ মে, সোমবার
পুনরুত্থানকালের ৬ষ্ঠ সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-২)
শিষ্য ১৬: ১১-১৫, সাম ১৪৯: ১-৬, ৯, যোহন ১৫: ২৬--১৬:৪

১২ মে, মঙ্গলবার
পুনরুত্থানকালের ৬ষ্ঠ সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-২)
সাধু নেরেউস ও সাধু আখিলেউস, সাক্ষ্যমর, সাধু পান্ক্রাস, সাক্ষ্যমর
শিষ্য ১৬: ২২-৩৪, সাম ১৩৮: ১-৩, ৭-৮ যোহন ১৬: ৫-১১

১৩ মে, বুধবার
পুনরুত্থানকালের ৬ষ্ঠ সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-২)
ফাতেমা রাণী মারীয়া
শিষ্য ১৭: ১৫, ২২ -- ১৮: ১, সাম ১৪৮: ১-২, ১১-১৪, যোহন ১৬: ১২-১৫ *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:* ইসা ৬১: ৯-১১, সাম লুক ১: ৪৬-৫৫, লুক ১১: ২৭-২৮

১৪ মে, বৃহস্পতিবার
পুনরুত্থানকালের ৬ষ্ঠ সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-২)
প্রেরিতদূত সাধু মাথিয়াস, পর্ব
শিষ্য ১: ১৫-১৭, ২০-২৬, সাম ১১৩: ১-৮, মথি ১৫: ৯-১৭

১৫ মে, শুক্রবার
পুনরুত্থানকালের ৬ষ্ঠ সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-২)
শিষ্য ১৮: ৯-১৮, সাম ৪৭: ১-৬, যোহন ১৬: ২০-২৩

১৬ মে, শনিবার
পুনরুত্থানকালের ৬ষ্ঠ সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-২)
শিষ্য ১৮: ২৩-২৮, সাম ৪৭: ১-২, ৭-৯, যোহন ১৬: ২৩-২৮

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১০ মে, রবিবার
+ ২০০১ ফা. ফ্রান্সেকো স্পাঞ্জোলো, এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০৯ সি. এমিলিয়া মালতি মিনজ, সিআইসি (দিনাজপুর)
+ ২০১৮ ফা. ফিলিপ ডি' রোজারিও (চট্টগ্রাম)
+ ২০০২ ফা. আলফন্স জেনসিয়াম, ওএমআই

১২ মে, মঙ্গলবার
+ ১৯৯৩ ব্রা. ইসোদোর ফাবিউল জয়াল, সিএসসি (চট্টঃ)
+ ১৯৯১ ব্রা. রালফ্ বার্ণার্ড বেয়ার্ড, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৫ সি. মেরী ফিলোমিনা, আরএনডিএম
+ ২০১৪ সি. মেরী গ্লোরিয়া, পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)

১৩ মে, বুধবার
+ ১৯৮৭ ব্রা. জেমস তালারোভিচ, সিএসসি (ঢাকা)

১৪ মে, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৩৮ ফা. জ্যাঁ হামোন, সিএসি
+ ২০০৪ সি. মিরিয়াম রিচার্ড, সিএসি
+ ২০১৭ সি. মেরী সুশীলা, এসএমআরএ (ঢাকা)

১৫ মে, শুক্রবার
+ ১৯৩৮ ফা. সেলেস্টিন এফ. নিয়ার্ড, সিএসসি
+ ১৯৫৪ ফা. থিওডোর কাস্তেল্লি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৮ ফা. বেঞ্জামিন লাবে, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০২২ সি. মেরী মিটিল্ডা, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০২৪ সি. মেরী নিকোলাস দেছা, আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ২০২৫ সি. মেরী তেরেজা রোজারিও, আরএনডিএম (ঢাকা)

১৬ মে, শনিবার
+ ১৯৮৯ সি. মেরী এডিথ, আরএনডিএম (ঢাকা)

তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে

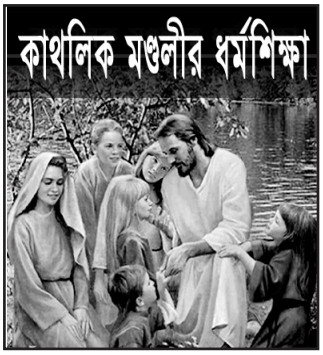

২১৬৫ দীক্ষাস্নানে খ্রীষ্টভক্ত মণ্ডলীতে তার নাম গ্রহণ করে। পিতামাতা, ধর্মপিতামাতা এবং পালকের লক্ষ্য রাখা উচিত যেন সে খ্রীষ্টীয় নাম গ্রহণ করে। প্রতিপালক সাধু বা সাধ্বীর ভ্রাতৃ প্রেমের আদর্শ এবং তার কাছ থেকে প্রার্থনার নিশ্চয়তা পাওয়া যায়।

২১৬৬ খ্রীষ্টভক্ত তার প্রার্থনা এবং সব কাজ আরম্ভ করে ক্রুশের চিহ্নের মাধ্যমে: "পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা - নামে, আমেন।

২১৬৭ ঈশ্বর প্রত্যেককেই তার নাম ধরে ডাকেন।

(ক) বিশ্রামবার (সাব্বৎ দিন)

২১৬৮ দশ-আজ্ঞার তৃতীয় আজ্ঞা বিশ্রামের পবিত্রতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়: "সপ্তম দিনে এমন পুরো বিশ্রাম উদ্‌যাপিত হবে, যে বিশ্রাম প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র।

২১৬৯ বিশ্রামের কথা বলতে গিয়ে পবিত্র শাস্ত্রির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়: "কেননা প্রভু ছ'দিনে আকাশ, পৃথিবী ও সমুদ্র এবং সেগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে, সমস্ত নির্মাণ করেছেন, কিন্তু সপ্তম দিনে বিশ্রাম করেছেন; এজন্য প্রভু সাব্বৎকে আশীর্বাদ করেছেন ও পবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন।

২১৭০ পবিত্র শাস্ত্র আবার বিশ্রামবারের মধ্য দিয়ে মিশরের বন্দীদশা থেকে ইস্রায়েলীয়দের মুক্তির স্মারক-অনুষ্ঠানের কথা প্রকাশ করে: মনে রেখো, মিশর দেশে তুমি দাস ছিলে, এবং তোমার পরমেশ্বর প্রভু শক্তিশালী হাতে ও প্রসারিত বাহুতে সেখান থেকে তোমাকে বের করে আনলেন; এজন্য তোমার পরমেশ্বর প্রভু সাব্বাৎ দিন পালন করতে তোমাকে আজ্ঞা করেছেন।

২১৭১ প্রভু ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের বিশ্রামবার দিয়েছেন একটি অপ্রত্যাহারযোগ্য সন্ধির চিহ্নরূপে পালন করার জন্য। বিশ্রামবার প্রভুরই জন্য পবিত্র এবং পৃথক করে রাখা হয়েছে যাতে তাঁর সৃষ্টি কাজ এবং ইস্রায়েল জাতির পক্ষে তাঁর মুক্তিকাজের জন্য তারা ঈশ্বরের প্রশংসা করতে পারে।

২১৭২ ঈশ্বরের কাজ মানুষের কাজের আদর্শ। যদি পরমেশ্বর প্রভু সপ্তম দিনে "বিশ্রাম নিয়ে প্রাণ জুড়িয়ে থাকেন" তবে মানুষেরও উচিত 'বিশ্রাম' নেওয়া এবং অন্যদের বিশেষতঃ গরিবদের "বিশ্রাম নিয়ে প্রাণ জুড়াতে" সাহায্য করা। বিশ্রাম দৈনন্দিন জীবনের কাজে কিছুটা বিরতি এবং অবসর দেয়। এই দিনটি হচ্ছে কাজের দাসত্ব এবং অর্থপূজার বিরুদ্ধে প্রতিবাদসরূপ।

২১৭৩ সুসমাচার এমর বহু ঘটনার উল্লেখ আছে যেখানে যীশুকে বিশ্রামবারের বিধান লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু যীশু কখনো দিনটির পবিত্রতা ক্ষুণ্ন হতে দেননি। তিনি বিধানটির খাঁটি ও প্রামাণিক ব্যাখ্যা দেন। "সাব্বাৎ মানুষের জন্যই সৃষ্ট হয়েছে, মানুষ সাব্বাতের জন্য সৃষ্টি হয়নি। সমবেদনা নিয়ে খ্রীষ্ট বিশ্রামবারকে কারো ক্ষতি করার চেয়ে বরং ভাল কিছু করার, হত্যা করার চেয়ে বরং প্রাণ রক্ষা করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। বিশ্রামবার করুণানিধান প্রভুর দিন এবং ঈশ্বরকে সম্মান করার দিন। "তাই মানবপুত্র সাব্বাতেরও প্রভু।

(খ) প্রভুর দিন

পুনরুত্থানের দিন: নতুন সৃষ্টি

২১৭৪ সপ্তাহের প্রথম দিনেই মৃতদের মধ্যে থেকে যীশু জীবিত হয়ে উঠেছিলেন। "প্রথম" দিন বলে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের দিনটি প্রথম সৃষ্টির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিশ্রামবারের পরে "অষ্টম দিনটি" খ্রীষ্টের পুনরুত্থানে সাধিত নতুন সৃষ্টির প্রতীক। তাই ওটা খ্রীষ্পের নতুন সৃষ্টির প্রতীক হয়ে ওঠে। খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের জন্য এই দিনটি হয়েছে সব দিনের মধ্যে প্রথম, সকল পর্বের মধ্যে প্রথম পর্ব, প্রভুরই দিন (hé kuriaké hémera, Dies dominica)-রবিবার।

মাতৃ দিবস (Mother's Day)

ডেভিড স্বপন রোজারিও

"মাতৃ দিবস" হলো, মায়েদের সম্মানে পালিত একটি দিন, যা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উদ্‌যাপিত হয়। এর আধুনিক রূপটির উৎপত্তি হয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্রে। মা দিবসটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আন্না জার্ভিস (ANNA JARVIS), যিনি তাঁর নিজের মাকে সম্মানিত করতে চেয়েছিলেন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম "মা দিবস" গির্জার উপাসনালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এর ছয় বছর পর দিনটি একটি জাতীয় ছুটির দিনে পরিণত হয় এবং প্রতি বছর মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার এটি পালন করা হয়। "মা দিবস", কার্ড, ফুল এবং পারিবারিক নৈশভোজ সহ অন্যান্য নানা আয়োজনের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করা হয়ে থাকে। আরও অনেক দেশই এই নির্দিষ্ট তারিখে উৎসবটি উদ্‌যাপন করে থাকে, আবার কেউ কেউ বছরের অন্য কোনো সময়ে এটি পালন করে। "মধ্যযুগে" (Middle Age) এমন একটি প্রথার উদ্ভব হয়েছিল যে, যারা নিজেদের এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিল, তারা আবার উপবাস কাল (LENT) পর্বের চতুর্থ রবিবার তাদের নিজ নিজ প্যারিশে, গির্জায় এবং মায়েদের সাথে দেখা করতে যেতে পারত। ব্রিটেনে (Britain) এটিই পরবর্তীতে "মাদারিং সানডে" (Mothering Sunday) হিসাবে পরিচিতি লাভ করে এবং আধুনিক যুগ পর্যন্ত এর প্রচলন অব্যাহত ছিল, যদিও বর্তমানে "মা দিবস" এর আগমনের ফলে, এই প্রথাটি অনেকাংশেই তার পূর্বের স্থান হারিয়েছে।

একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থেকে জানতে পারা যায় যে, জার্ভিস (Jervis) তার মা এ্যান জার্ভিস দ্বারা এই ছুটির দিনটি প্রবর্তনে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁর মা বন্ধুত্ব ও স্বাস্থ্যের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি প্রসারের লক্ষ্যে "নারী দল" গঠন করেছিলেন।

১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে, "আমেরিকার গৃহযুদ্ধের" সমাপ্তির তিন বছর পর অ্যান জার্ভিস (Ann Jervis) উল্লেখ করেন যে, ইউনিয়ন ও মৈত্রীচুক্তিবদ্ধ (Confederate Veterans) বাহিনীর প্রবীণ সৈনিক এবং তাদের পরিবারবর্গের মধ্যে পুনর্মিলন উৎসাহিত করার লক্ষ্যে "Mother's Friendship Day" এর আয়োজন করেছিলেন। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে যখন আন্না জার্ভিসের (Ann Jervis) বয়স ছিল মাত্র ১২ বছর, তখন তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, একটি SUNDAY SCHOOL CLASS শেষে তাঁর মা, ঈশ্বরের চরণে এই বলে প্রার্থনা করছেন, "আমি আশা করি এবং প্রার্থনা করি যে, কেউ না কেউ, কোনো এক সময়ে, এমন একটি স্মরণ দিবসের সূচনা করবেন, যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানবতার সেবায়, তিনি যে অতুলনীয় অবদার রেখে চলেছেন, তার স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে। তাঁর মা বলেছিলেন, "তিনি এর যোগ্য"। Ann Jervis তাঁর মায়ের সেই প্রার্থনা কখনোই বিস্মৃত হননি। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে অ্যান জার্ভিসের মৃত্যুর পর, তাঁর কন্যা স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বক্তৃতা প্রদানের মাধ্যমে একটি প্রচার অভিযান শুরু করেন। তিনি এবং তাঁর সমর্থকরা মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার, "মাতৃ দিবস" পালনের পক্ষে মত দিয়েছিলেন, যে দিনটি ছিল অ্যান জার্ভিসের মৃত্যুদিন।

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে, ১২ মে, GRAFTON WEST VIRGINIA তে, জার্ভিসের প্রয়াত মায়ের গির্জায় একটি মা দিবসের অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল। পাঁচ বছরের মধ্যেই কার্যত প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে এই দিনটি পালন করতে শুরু করে এবং ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট WOODREW WILSON এটিকে একটি জাতীয় ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করেন। যদিও জার্ভিস তাঁর মায়ের প্রিয় ফুল, সাদা, গোলাপি কিংবা লাল রং এর সুগন্ধি ফুল এবং মায়ের স্মরণে সাদা পোষাক পরিধান করে দিনটি উদ্‌যাপন করে থাকে।

সময়ের পরিক্রমায় এই দিনটির পরিধি প্রসারিত হতে থাকে, এবং এতে ঠাকুরমা (Grand Mother's), মাসি (Aunty) এর মতো এমন সব নারীরাও অন্তর্ভুক্ত হন, যারা মায়ের ভূমিকা পালন করে থাকেন।

আজও যাদের মা বেঁচে আছেন, তারা কত সৌভাগ্যবান। তাঁদের সেবার মাধ্যমে, নিশ্চয়ই তারা আশীর্বাদ পাবেন। মা যখন জীবিত থাকেন, অনেক সময় অবহেলা অশ্রদ্ধা নানা দুর্ব্যবহার করে থাকি। নিজেদের সুখ নিয়ে এত ব্যস্ত থাকি যে, তাদের নিয়মিত চিকিৎসা, খাদ্য-বস্ত্র, নিরাপদময় জীবন, এমনকি চাওয়া পাওয়া নিয়ে কোন চিন্তা করি না। একদিন হয়তো হারিয়ে খুঁজি, আমাদের কৃতকর্মের জন্য রোদন করি, বিলাপ করি, অনুতপ্ত হই, কিন্তু কি লাভ? তারা যদি বেঁচে না থাকেন? মার কথা মনে হলে নানা স্মৃতি এসে ভীড় করে, তখন মনবীণায় বেজে উঠে, মার গান:

মধুর আমার মায়ের হাসি,
চাঁদের মুখে ঝরে,
মাকে মনে পড়ে আমার,
মাকে মনে পড়ে।

আজ আধুনিক বিশ্বে, জীবন যুদ্ধের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে আমাদেরকে অবিরাম সংগ্রাম করতে হচ্ছে। অর্থনৈতিক মন্দা, মুদ্রাস্ফীতি সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা, তদুপরি রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য, মানুষ আজ দিশেহারা। সবাই নিজেকে নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত। নষ্ট করার মত এতটুকু সময় নেই। এসব কারণে মানবিক মূল্যবোধও অনেক সময় হ্রাস পায়। পারিবারিক বন্ধনও একটা সময় পর কেমন যেন ফিকে হয়ে যায়। বিভিন্ন সময় সামাজিক মাধ্যমে বৃদ্ধ পিতা-মাতাদের প্রতি নানা নির্যাতন, অবহেলা, তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের সংবাদ ভেসে আসে, যারা নিতান্তই গরিব, গ্রামে থাকে, তাদের কোন উপায় নেই। শত অপমান-লাঞ্চনার মাঝেও স্বামীর ভিটায় মুখ গুজে পড়ে থাকতে হয়। তবে বিত্তবান সন্তান যারা শহরে বা বিভিন্ন উন্নত দেশে বসবাস করে তাদের কথা বেশি শোনা যায়, বিভিন্ন কারণে বৃদ্ধ পিতা-মাতাদের স্থান হয়, "হোম" বা "বৃদ্ধাশ্রমে", তবে এর ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। ফলে, এসব অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের কথা ভেবেই, মহাপ্রাণ ব্যক্তিরা বৃদ্ধাশ্রমগুলি গড়ে তুলেছেন। যদিও অসহায় এই বাবা-মাদের সন্তানদের প্রতি নানা অভিমান, অভিযোগ হৃদয়ে পুঞ্জিভূত হয়ে থাকে, কিন্তু পারতপক্ষে তারা পরিচিত অপরিচিত জনদের সামনে, তাদের অভিশাপ দেয় না বরং সর্বদা মঙ্গল কামনা করে। স্নেহের সন্তানদের বাড়িতে ঠাঁই হলো না বলে হৃদয়ের ব্যথা সহজে প্রকাশ করতে চায় না। তারা বর্তমান অবস্থানকে মেনে নিয়ে বৃদ্ধাশ্রমের অন্যান্য সকলের সুখ-দুঃখ ভাগ করে নিয়ে বাকি জীবন পার করে দিতে চায়। মনে মনে ভাবি, অবহেলা, অশ্রদ্ধা, অপমানের চেয়ে, দূরে সরে থাকাই ভালো। বিভিন্ন পাক-পার্বণে বা কোন উৎসবে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে, বৃদ্ধাশ্রমের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নানা আক্ষেপ-অসন্তোষের কথা শোনা যায়। মূলতঃ এই অসহায় নির্যাতিত মা-বাবাদের কথা চিন্তা করেই, বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী নচিকেতা চক্রবর্তী অসাধারণ এ গানটি গেয়েছিলেন,

বৃদ্ধাশ্রম

ছেলে আমার মস্ত মানুষ, মস্ত অফিসার,
মস্ত ফ্লাটে যায় না দেখা, এপার-ওপার,
নানান রকম জিনিস আর আসবাব দামি দামি,
সব চেয়ে কম দামি ছিলাম, একমাত্র আমি,
ছেলের আমার, আমার প্রতি, অগাধ সম্ভ্রম,
আমার ঠিকানা তাই বৃদ্ধাশ্রম। (আংশিক)

বলা-বাহুল্য, উন্নত দেশে "হোমে" বা "বৃদ্ধাশ্রমে" সব ধরনের সু-বন্দোবস্ত আছে। টিভি রুম, লাইব্রেরী, খেলাধুলা ও ব্যায়ামের নানা আধুনিক সরঞ্জাম। থাকা-খাওয়া ও চিকিৎসার মতো মৌলিক অধিকার। নিয়মিত সেবা-যত্নের জন্য সার্বক্ষণিক অভিজ্ঞ ও পেশাদার লোক নিয়োজিত থাকে। সরকারি সংস্থাগুলির পাশাপাশি, অনেক প্রাইভেট সংস্থাও, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, গৃহহীন, নিঃস্ব নির্যাতিত মানুষের জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা করে থাকে।

একজন মানুষ হিসাবে "হোমে" যেমন: মর্যাদা, স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, সেবা-যত্ন আছে, তেমনি আছে, অবসাদ, বিষন্নতাময় এক নিঃসঙ্গ জীবন। নেই কেবল প্রিয়জনদের স্নেহের স্পর্শ, নিবিড় সান্নিধ্য, অকৃত্রিম ভালোবাসা, শ্রদ্ধাভক্তি ও আপনজনদের ঘিরে একত্রে বসবাসের মত "স্বর্গসুখ"। আজ থেকে দু'হাজার বছর পূর্বে, এদের কথা ভেবেই ত্রাণকর্তা প্রভু যিশু খ্রিস্ট যে বাণী দিয়েছিলেন তা নিম্নে তুলে ধরলাম (পবিত্র বাইবেলে নতুন নিয়মে যেমনটি আছে)।

বধ্যভূমির দিকে যিশুর যাত্রা: যিশুকে যখন মারবার জন্য বধ্যভূমির দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সেই সময় সাইরেণীর শিমোন সবে মাত্র গ্রাম থেকে জেরুশালেমে আসছিল, তারা তাকে ধরে জোর করে তার কাঁধে ক্রুশ চাপিয়ে দিল যেন সে যিশুর পিছন পিছন ক্রুশটা বয়ে নিয়ে যায়। এক বিরাট জনতা যিশুর পিছন পিছন চলল, তাদের মধ্যে অনেক স্ত্রীলোকও হা-হুতাশ করতে করতে যাচ্ছিল। "যিশু তাদের দিকে ফিরে বললেন ওগো জেরুশালেমের মেয়েরা, আমার জন্য কেঁদো না, বরং তোমাদের ও তোমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য কাঁদো। কারণ এমন দিন আসছে যখন বন্ধ্যা স্ত্রীলোকদেরই সুখী বলা হবে।" *(লূক ২৩: ২৬-২৯ পদ)*

বিখ্যাত মনিষীদের মূল্যবান বাণী

"আমার ভাগ্যে এতটুকুও, দুঃখ থাকত না,
যদি ভাগ্য লেখার দায়িত্বটা
আমার, হাতে থাকত।"
- এপিজে আব্দুল কালাম

"মায়ের উপরে কখনো,
মেজাজ দেখাইয়ো না ভাই,
সূর্য ডুবে গেলে পৃথিবী অন্ধকার,
তেমনি মা চলে গেলে, দুনিয়া অন্ধকার"
- সংগৃহীত

"সব ধর্মের মধ্যে
যদি কোন সত্য ধর্ম থাকে
সেটা হলো মাতৃসেবা।"
-স্বামী বিবেকানন্দ

একজন মায়ের ভালোবাসা পৃথিবীর
সকল প্রেমের চেয়েও বিশুদ্ধ।"
- মাদার তেরেসা

"জীবনে প্রথম যিনি
তোমাকে ভালোবাসে, তিনিই মা।"
- রুমি, ফরাসি কবি

"তুমি আমাকে একজন ভালো মা দাও
আমি তোমাকে একটি ভালো জাতি দেবো।"
- নেপোলিয়ান বোনাপার্ট

"জগতের মধ্যে যদি ঈশ্বরকে
কোথাও দেখা যায় তবে সেটা
মায়ের ভালোবাসার মধ্যে।"
- মহাত্মা গান্ধী

সৌজন্যে: *অনলাইন*

"তোমরা আছ আমাদের হৃদয়ে"

২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত বিচিত্রা রোজলিন গমেজ
জন্ম : ২৯ অক্টোবর, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৪ মার্চ, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ

২৮তম মৃত্যুবার্ষিকী

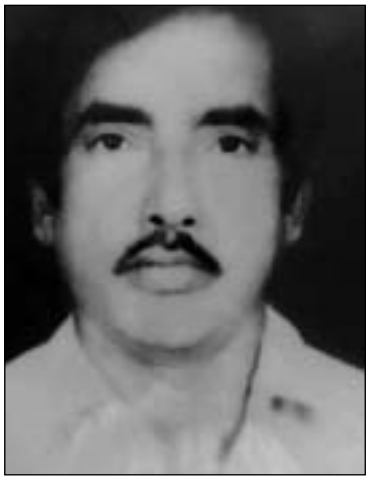

প্রয়াত যোসেফ গমেজ
জন্ম : ৪ এপ্রিল, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১২ মে, ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ

তোমরা কেমন আছ? তোমাদের খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। এই পৃথিবীর পান্থশালায় আমরা শত দুঃখ কষ্টেও শুধুমাত্র তোমাদের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছি। তোমাদের কথা মনে হলে প্রাণ বারবার কেঁদে ওঠে। এ জগৎ সংসারে তোমাদের সুন্দর জীবনাদর্শের গুণাবলী আমাদের নিত্য দিনের চলার পথের পাথেয়। নিশ্চয়ই তোমরা বাবা-মেয়ে স্বর্গে প্রভুর সাথে সুখে আছ। স্বর্গ হতে প্রতিনিয়ত তোমরা আমাদের জন্যে প্রার্থনা করো, আমরা যেন তোমাদের জীবনের সততা, ন্যায়পরায়ণতা, কর্মঠ ও বিশ্বস্ততা এবং সুন্দর ভালোবাসাপূর্ণ জীবন-যাপন করতে পারি।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

স্ত্রী : শিশিলিয়া গমেজ
ছেলে ও ছেলে বউ : দিলীপ-পুষ্প, অনুপ-সম্পা, অসীম-চামেলী ও ব্রাদার রিপন সিএসসি
মেয়ে ও মেয়ে জামাই : সুচিত্রা-হেনরী, সুমী-অপু এবং ভুবন
নাতি-নাতি বউ : জনি-শশী, নিবিড়, অর্পণ ও অনুরুদ্ধ
নাতিন ও জামাই : হ্যাপী-অনিক, কিশোরী-সুজন, বিন্দু-রেক্সি, বৃষ্টি-অনিক, অন্তী, অর্থী, মিচেল, নদী, অর্না, রিমঝিম ও অরিন।
পুতিন : প্রান্তর, সুর, অনয়া, আরিয়া, লেওনার্দো হেনরী কস্তা, মানভি কস্তা
গ্রাম : হাড়িখোলা, তুমিলিয়া ধর্মপল্লী, জেলা : গাজীপুর

বিজ্ঞ/১৭/২৬

বিশেষ প্রতিবেদন

মা সন্তানের ভরসার আশ্রয়স্থল

'মা'–পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম অথচ মধুরতম শব্দ। এই একটি শব্দের মাঝেই লুকিয়ে আছে অসীম ভালোবাসা, ত্যাগ ও নিরাপত্তার আশ্রয়। মা শুধু সন্তানের জন্মদাত্রীই নন, তিনি প্রথম শিক্ষক, জীবনের পথপ্রদর্শক এবং নিঃস্বার্থ বন্ধু। মা দিবসের মূল উদ্দেশ্য হলো, আমাদের জীবনে মায়ের যে অপরিসীম অবদান ও ত্যাগের মহিমা, তার প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। যদিও মাকে ভালোবাসার জন্য কোনো বিশেষ দিনের প্রয়োজন হয় না; প্রতিটি দিনই মা দিবস হওয়া উচিত। তবুও বিশ্ব মা দিবস আমাদের যান্ত্রিক জীবনের ব্যস্ততার মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে মাকে কিছুটা বিশেষ সময় দেওয়ার সুযোগ করে দেয়। এটি এমন একটি বিশেষ দিন, যা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মায়ের নিঃস্বার্থ ভালোবাসার কোনো প্রতিদান হয় না, শুধু শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাই তাঁদের প্রাপ্য। আর তাই মা দিবসকে কেন্দ্র করে সকল মায়েদের স্মরণে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সম্পাদক সহযোগী বিশাল পেরেরা ও নব কস্তার সহযোগিতায় এই বিশেষ প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হলো।

১. আপনার নাম, পেশা এবং পরিবার সম্পর্কে কিছু বলুন এবং মা হওয়ার পর আপনার জীবনে কী ধরণের পরিবর্তন এসেছে বলে আপনি মনে করেন?

আমি জয়া পিউরীফিকেশন, আমার স্বামী পিন্টু পিউরীফিকেশন। আমার গ্রাম ভেটুর, তুমিলিয়া ধর্মপল্লী। আমার এক ছেলে ও এক মেয়ে। আমি একজন গৃহিণী। আমার জন্মস্থান শুলপুর ধর্মপল্লী অর্ন্তগত বড়ইহাজী গ্রাম। আমার বাবা ডানিয়েল গমেজ ও মা মার্গ্রেট গমেজ। আমাদের আট ভাইবোনদের মধ্যে আমি আমার বাবা-মায়ের ষষ্ঠ সন্তান। আমার পড়াশোনার জীবনে আমি ১ম থেকে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত শুলপুরে ছিলাম এবং ৮ম থেকে এসএসসি পর্যন্ত পানজোরা হোস্টেলে থেকে পানজোরা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং এসএসসি-এর পর আবার শুলপুর এসে শ্রীনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজে এইচএসসি থেকে বিএ পর্যন্ত পড়াশোনা করি। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে ২১ অক্টোবর আমি তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর ভেটুর গ্রামে বিয়ে হয়ে এসেছি।

মা হওয়ার পর আমার জীবনে অনেক পরিবর্তন এসেছে। আমার খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা ও মানসিক দিক দিয়ে অনেক পরিবর্তন আমি অনুভব করি। বিশেষ করে আমার ছেলে জন্মানোর পর আমরা মা ও ছেলে দুইজনেই অনেক অসুস্থ ছিলাম। তবে ধৈর্য্য ধরে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেছি এবং এখন পর্যন্ত সুস্থ আছি।

২. সন্তান লালন-পালন ও যত্নের চ্যালেঞ্জ কিভাবে মোকাবেলা করেছেন? সন্তান ও আপনার মধুর স্মৃতি কী?

সন্তান লালন পালনের ক্ষেত্রে আমাকে অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছে। একটা শিশুকে আদর-যত্ন করে খাওয়ানো সবই প্রথম প্রথম কষ্টকর ছিল যা ধীরে ধীরে অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। ছেলে মেয়েকে স্নান করতে গেলে ভয় লাগতো, খাওয়াতে গেলে ভয় লাগতো। তবে এই ভয়ের পরেও সকল কাজ আমি শিখেছি, করেছি।

আমার সন্তাদের সাথে অনেক স্মৃতি আমার আছে। তার মধ্যে একটি হলো; একদিন সময় করে আমার স্বামী-সন্তানদের সাথে শীতলক্ষ্যা নদীতে নৌকা ভ্রমণে গিয়েছিলাম। আর এই; যে সময়টা আমরা একসাথে পার করেছি যা এখন পর্যন্ত আমার কাছে একটি মধুর স্মৃতি হয়ে আছে। কারণ আমাদের নানা কর্মব্যস্ততার জন্য আমরা সবসময় এক হতে পারি না। তাই ঐ সময়টাই আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছিল এবং এখনো স্মৃতি হয়ে আছে।

৩. আপনার মায়ের কাছ থেকে পাওয়া কোন কোন শিক্ষা বা মূল্যবোধগুলো আপনি আপনার সন্তানকে দিতে চান?

আমার মা একজন নম্র ও খুবই সাধারণ মানুষ ছিলেন। অনেক কষ্ট করে সংসার জীবনে আমাদের আট ভাইবোনদেরকে মানুষ করেছে। আমি আমার সন্তানদের নম্রতা, ধৈর্য্য ও শান্তিপূর্ণভাবে সবার সাথে চলার ও জীবন গঠনের শিক্ষা দিতে চাই। আমি চাই তারাও যেন সব সময় সবার সাথে মিলেমিশে থাকে কষ্টের সময়ও যেন ভেঙ্গে না পড়ে।

৪. নতুন মায়ের জন্য আপনার কী পরামর্শ?

বর্তমান যারা নতুন মা তাদের জন্য আমার পরামর্শ হচ্ছে; সংসারে অভাব, দুঃখ-কষ্ট আনন্দ সবই থাকে। শত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও তারা যেন ধৈর্য্য ধরে রাখে, নিয়মিত প্রার্থনা করে এবং প্রতি রবিবারে যেন খ্রিস্টযাগে যোগদান করে। একজন ভাল মা একটি ভাল পরিবার গঠন করতে পারে। সন্তানরা সর্বদাই তার মায়ের মত হতে চায়। মা ভালো হলে সন্তানও ভাল হয়।

৫. সন্তানদের কাছে কী প্রত্যাশা করেন?

সন্তানদের কাছে আমার প্রত্যাশা- সন্তানেরা যেন বাবা-মায়ের বৃদ্ধ বয়সে যত্ন নেয় ও তাদেরকে মানসিক শান্তিতে রাখে।

৬. সমাজে মায়েদের ভূমিকা কেমন হতে পারে বলে আপনি মনের করেন?

সমাজে একজন মা হবে নমনীয় ও ধৈর্য্যশীল নারী। মা হচ্ছে সন্তানদের ভরসার অন্যতম আশ্রয়। সন্তান ভুল করলেও মা তাদেরকে বুকে টেনে নেয়। মা সবসময় ছেলে-মেয়েদের মঙ্গল কামনা করে। সঠিক পথের নির্দেশনা দান করে।

❖উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর আলোকে ময়মনসিংহের একজন মা বলেন,

আমি রোজী রংমা। আমি কারিতাস বাংলাদেশের ময়মনসিংহ অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক। আমি মনে করি, মা হওয়ার পর আমার জীবনে সবচেয়ে বড় যে পরিবর্তন এসেছে তা হচ্ছে আমার চিন্তায়, আচরণে, দায়িত্ববোধ ও অগ্রাধিকারের জায়গায়। আগে নিজের লক্ষ্যগুলোই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এখন সন্তানের জন্য চিন্তা করি। তাদের ভালো মন্দ, সুবিধা-অসুবিধা এখন আমার অগ্রাধিকার এবং সিদ্ধান্তের কেন্দ্রে থাকে। মা হবার পরে আমি আরও ধৈর্যশীল, সহানুভূতিশীল ও শক্ত হয়ে উঠেছি। কর্মজীবন ও পরিবার এই দুটোকে সামলে চলার মধ্যে আমি নিজের মধ্যে নতুন এক আনন্দ ও শান্তি খুঁজে পেয়েছি।

একজন কর্মজীবী মা হিসেবে অন্যান্য সকল মায়ের মতই সময় ব্যবস্থাপনা করাটা আমার জন্য একটু কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তবে আমি চেষ্টা করি অফিসের কাজ ও পরিবারের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে। যতটুকু সময় পাই অফিসের ব্যস্ততার মাঝেই সন্তানদের সাথে সময় ব্যয় করতে বিশেষ করে সাপ্তাহিক ছুটিতে পার্কে বা প্রকৃতির কাছাকাছি কোথাও ঘুরতে যেতে বা মার্কেটে যেতে চেষ্টা করি, তাদের পছন্দের জিনিস বা কাজ করতে চেষ্টা করি। পরিবার থেকেও বিশেষ করে আমার স্বামী আমাকে এক্ষেত্রে অনেক বেশি সহযোগিতা করে, যা আমাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

মধুর স্মৃতি বলতে আসলে অনেক আছে, কিন্তু তাদের সাথে কাটানো ছোট ছোট বিভিন্ন মুহূর্তগুলো যেমন, তার প্রথম কথা বলা, মা বলে ডাকা, তাকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া, আর অফিস শেষে বাসায় ফিরলে গায়ের সাথে মিশে থাকার যে অভিপ্রায় এগুলো আমি খুবই উপভোগ করি এবং শুধু মধুরই ন্যায় মূল্যবান স্মৃতি বটে।

নিজের মাকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করে রোজী বলেন,

আমি মাকে খুব বেশি কাছে পাইনি, খুব ছোট বেলায় তাকে হারিয়েছি। কিন্তু আমার মা গ্রামের সবচেয়ে সহজ, সরল, বিনয়ী ও দয়ালু নারী ছিলেন। আমি মা'কে যতদিন কাছে পেয়েছি, মায়ের কাছ থেকে আমি তার সততা, দায়িত্বশীলতা, পরিশ্রম এবং মানুষের প্রতি তার যে আন্তরিকতা সেই শিক্ষাটা লাভ করেছি। তিনি আমাকে একজন ভাল মানুষ হবার শিক্ষা দিয়েছেন, ভালবাসতে শিখিয়েছেন। আমি চাই আমার সন্তানরাও মননে ও মূল্যবোধে ধনী হয়ে বেড়ে উঠুক। বিশেষ করে নিজের ও অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান এবং একজন ভাল মানুষ এবং দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে বড় হয়ে উঠুক।

ইতিবাচক থাকুন; চিন্তায় ও কাজে। নিজেকে সময় দিন, নিজের যত্ন নিন এবং নিজের প্রতি সহানুভূতিশীল হোন। সাহায্য চাইতে দ্বিধা করবেন না এবং নিজের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতাকেও গুরুত্ব দিন। সন্তান লালন-পালন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে প্রতিদিন নতুন নতুন কিছু শিখতে হবে এবং বেড়ে উঠতে হবে মা হিসেবে সন্তানের সাথে।

সন্তানদের কাছ থেকে খুব বেশি কিছু প্রত্যাশা করি না, এ প্রজন্মের ছেলেমেয়ে তো, তাই শুধু চাই তারা ভালো মানুষ হয়ে উঠুক, খ্রিস্টীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠুক। তারা যেন সৎ, দায়িত্বশীল এবং অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। জীবনে সফলতার পাশাপাশি মানবিকতা বজায় রাখাটাই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজ গঠনে মা ও বাবা উভয়ের ভূমিকাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর শুধু মায়েদের ভূমিকা বলতে গেলে; একজন মা শুধু একটি সন্তানকেই নয়, বরং আগামীর ভবিষৎ প্রজন্মকে গড়ে তোলে। তিনি তার সন্তানের মধ্যে যে মূল্যবোধ ও শিক্ষা দেন, সেটাই ভবিষ্যতের সমাজকে প্রভাবিত করে। তাই মায়েদের ক্ষমতায়ন ও তাদের প্রতি সম্মান নিশ্চিত করা সমাজের উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য একটি বিষয়।

❖জীবনযুদ্ধে হার না মানা এক মা, মমতা। তিনি বলেন,

আমার নাম মমতা আন্না পালমা। আমার পেশা শিক্ষকতা। আমার কাছে পরিবার মানেই স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে একত্রে ভালোবাসার বন্ধনে বসবাসের আশ্রয়স্থল। যেখানে সুখ-দুঃখ, হাসি, কান্না, আনন্দ, বেদনা সবই আছে। তবে এরই মধ্যে খুঁজে নিতে হয় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। আমি একজন মা। এই একটি পরিচয়ই আজ আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়। মা হওয়ার আগে আমার জীবন ছিল শুধু নিজেকে নিয়ে। কিন্তু যেদিন আমার সন্তান পৃথিবীতে আসে, সেদিন থেকে আমার জীবনটা একেবারেই বদলে যায়। আমি যেন অন্য পৃথিবীর মানুষ হয়ে যাই। প্রতিটি দিনের প্রতিটি মুহূর্ত আমি আমার সন্তানকে নিয়েই ব্যস্ত থাকি। মাতৃত্ব আমার অন্তরের ভালোবাসাকে বিশাল করে তুলে। আমি আমার সর্বস্ব উজার করে-সন্তানদের নিয়ে বেঁচে আছি। আমি আগের চেয়ে অনেক বেশি ধৈর্যশীল, সহনশীল এবং ভালোবাসায় পরিপূর্ণ একজন মা।

২. সন্তান লালন-পালন ও যত্নের চ্যালেঞ্জ কিভাবে মোকাবেলা করেছেন?

সন্তান লালন-পালান ও যত্নের চ্যালেঞ্জ খুবই কঠিন কাজ। তারপর ও কেন জানি সন্তানের মুখের দিকে তাকালে সবই সহজ মনে হয়। সন্তান যে কি অমূল্য সম্পদ তা শুধু একজন গর্ভধারিণী মা-ই বুঝেন।

৩. আপনার মায়ের কাছ থেকে পাওয়া কোন কোন শিক্ষা বা মূল্যবোধগুলো আপনি আপনার সন্তানকে দিতে চান?

আমার মা ছিলেন আমার কাছে লক্ষ মায়ের চেয়েও বেশি ভালোবাসার। তিনি ছিলেন নম্র, বিনয়ী, সহজ-সরল, ধার্মিকা, সুন্দর মনের একজন মানুষ। আমি চাই আমার সন্তানেরাও যেন আমার মার এই গুণগুলো ধারণ করে জীবনে আদর্শ মানুষ হতে পারে।

৪. নতুন মায়ের জন্য আপনার কী পরামর্শ?

নতুন মায়েদের জন্য আমার প্রথম অনুরোধ, তাদের ধৈর্যশক্তি, নম্রতা ও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ মন মানসিকতা থাকতে হবে। কারণ বর্তমানের মায়েদের ভালোবাসা ও আন্তরিকতার অভাব। যার কারণে নানা রকম সমস্যায় আমরা প্রতিনিয়ত কষ্ট পাচ্ছি।

৫. সন্তানদের কাছে কী প্রত্যাশা করেন?

সন্তানদের কাছে আমার একটাই প্রত্যাশা তারা যেন মানুষের মত মানুষ হতে পারে। মন-মানসিকতা যেন উদার ও সহজ সরল হয়।

৬. সমাজে মায়েদের ভূমিকা কেমন হতে পারে বলে আপনি মনের করেন?

সমাজে মায়েদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একজন সচেতন আদর্শ মা-ই গড়ে তুলতে পারেন একটি আদর্শ সমাজ।

পরিশেষে বলা যায়, এই পৃথিবীর সকল মায়েরাই চান তার সন্তানরা যেন ভালো থাকুক, সৎ পথে চলুক ও দায়িত্বশীল হোক। ঠিক তেমনি প্রতিটি সন্তানের কর্তব্য তাদের মা-বাবার বৃদ্ধ বয়সে যেন তারা মা-বাবার পাশে থাকে, তাদেরকে সময় দেয় এবং মা-বাবার প্রতি দায়িত্বশীল হয়। সেই সাথে মায়ের প্রতি এই সম্মান ও ভালোবাসা যেন শুধু মা দিবসের এই বিশেষ দিনে সীমাবদ্ধ না থাকে, বরং বছরের প্রতিটি দিনই যেন মায়ের প্রতি আমাদের যত্ন ও ভালোবাসা অটুট থাকে।

মা

ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি

"মা তো মা"। মায়ের বিকল্প কখনও হয় না আর হবেও না। আমাদের দেশের অনেক অঞ্চলে বলেন যে, বড় মা, ছোট মা, আসলে মা তো শুধুই মা। আমাদের জীবন শুরু হয় একজন নারীর গর্ভে, যিনি দীর্ঘ নয় মাস নয় দিন ধরে নিজের শরীরের রক্ত ও ভালোবাসা দিয়ে তিলে তিলে গড়ে তুলেন। সেই জন্য মায়ের বিকল্প বা দ্বিতীয় জন কখনই হতে পারে না এবং তিনিই আমাদের সাড়া জীবনের মা। মায়ের প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও ভক্তি শুধু একদিনের বা প্রতি বছরের মে মাসের দশ তারিখের নয় বরং আজীবনের জন্য। তাই ফকির আলমগীর গানের মধ্য দিয়ে আমাদের শিক্ষা দিয়ে তিনি বলেছেন যে, "মায়ের একধার দুধের দাম কাটিয়া গায়ের চাম পাপোশ বানাইলে ঋণের শোধ হবে না"। আমাদের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ধনী ব্যক্তি হলেন মা। আব্রাহাম লিংকন তাই বলেছেন যে, "যার মা আছে, সে কখনই গরিব নয়"। মা হলো আমাদের সেই প্রদীপ, যা নিভে গেলে ঘর অন্ধকার হয়ে যায়। তাই আসুন, মায়ের প্রতি আমাদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা দিন দিন বাড়িয়ে তুলি ও সর্বোচ্চ সম্মানের স্থানে রাখি আমাদের মা জননীকে।

দিয়াগো ম্যারাডোনা বলেছেন যে, "আমার মা মনে করেন আমিই সেরা, আর মা মনে করেন বলেই আমি আজ সেরা হয়ে গড়ে উঠেছি"। অনেক সময় মায়ের ভূমিকা অনেকে পালন করতে পারে, আবার অনেক ধরনের মা ডাকা যেতে পারে, কিন্তু মা শুধুই একজন, যিনি আমাকে জন্ম দিয়েছেন। কারণ একজন মায়ের ভালোবাসার কোন তুলনা হয়না, তাঁর ত্যাগ অগণিত এবং শক্তি অপরিমেয়। সত্যিকারের মা হলেন তিনি, যিনি গর্ভেধারণ করেছেন। আমাদের জন্মদাতা পিতা ও মাতাগণ হলে ঈশ্বর কর্তৃক মনোনীত ও ঐশ পরিকল্পনা তাদের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে বাস্তবরূপ পেয়েছে। ঈশ্বর নিজেই বেছে নিয়েছেন বা ঠিক করেছেন যে, কে হবেন আমার মা। যিশুর মা হওয়ার জন্য যেমন কুমারী মারীয়াকে ঠিক করেছিলেন। মারীয়া তাই ঈশ্বর পুত্রের জননী ও আমাদের মা। একইভাবে ঐশ পরিকল্পনায় আমি বা আমরা কার গর্ভে জন্ম নিয়ে পৃথিবীর আলো দেখতে পাব বা পেরেছি, তা ঠিক করার মালিক একমাত্র ঈশ্বর। আমরা যা কিছু পেয়েছি তা মায়ের কাছ থেকে। ঈশ্বরের কাজ বা ঐশকর্ম সবসময় বোঝা যায় না সত্য, ঠিক একেইভাবে মা আমাদের আগমনের বার্তা প্রথমে বুঝতে না পারলেও, যখন তিনি বুঝতে পারেন তখন থেকেই তিনি নিজের মায়া-মমতা, ভালোবাসা, আদর-যত্ন, হৃদয়-মন দিয়ে আমাদের রক্ষা করা ও বেড়ে ওঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যান। নিজের সর্বশক্তি দিয়ে সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখিয়ে থাকেন। এ মহৎ কাজ করার জন্য ঈশ্বর শুধু একজন নারীকে বেছে নেন ও মনোনীত করেন। তিনি হলেন আমাদের জন্মদাত্রী মা। তাই হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত"। মা ছাড়া কোন সন্তানের অস্থিত্ব কল্পনা করা যায় না। জর্জ ওয়াশিংটন তাই বলেছেন যে, "আমার জীবনের সমস্ত অর্জন মায়ের কাছ থেকে পাওয়া নৈতিকতা, বুদ্ধিমত্তা আর শারীরিক শিক্ষার ফল"। আমরা যা হয়েছি ও পেয়েছি মায়ের নিকট থেকে। মা হলেন আমাদের জীবনের উৎস ও মায়ের রক্তে আমরা সৃষ্টি হয়েছি।

একজন 'মা' কখনই পছন্দ করেন না যে, তাঁর নিজের গর্ভের সন্তান অন্য কোন নারীকে মা বলে ডাকে। অন্যদিকে একজন মা শুধু আমার মা নয়, সবার মা। সকল মায়েদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখানো খুবই প্রয়োজন। একজন মা'কে অশ্রদ্ধা বা ছোট করা হলো নিজের মাকে অশ্রদ্ধা বা ছোট করা হয়। মায়ের প্রতি ভালোবাসা হলো পৃথিবীর সবচেয়ে নিঃস্বার্থ, গভীর ও পবিত্রতম অনুভূতি। মা সন্তানের সাহস, শক্তি এবং চলার পথের অনুপ্রেরণা। সারাজীবন নিজের সুখে-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে মা সন্তানকে আগলে রাখেন, যার কোন ঋণ শোধ করা সম্ভব নয়। মায়ের প্রতি ভালোবাসা শুধু বিশেষ দিনে নয়, বরং প্রতিদিনের মমতায় ও যত্নে প্রকাশ করা উচিত। মায়ের প্রতি ভালোবাসার গভীরতা ও প্রকাশ করার প্রধান উপায় হলো, নিঃস্বার্থ মমত্ববোধ; মায়ের ভালোবাসার অতুলনীয় যা কোন কিছুর সাথে তুলনা করা যায় না। নিরাপত্তা ও আশ্রয়; সন্তানের সব বিপদ আপদ, সুখে-দুঃখে মা ছায়ার মতো পাশে থাকেন।

মা হলেন পরিবারের মূল ভিত্তি, যিনি সবাইকে এক সুতোয় বেঁধে রাখেন। মায়ের ভালোবাসার ঋণ কখন শোধ করা যায় না, শুধু তাকে সম্মান ও ভালোবাসার মাধ্যমে কিছুটা শ্রদ্ধা জানানো যায়। মা কেবল জন্মই দেন না, তিনি সন্তানের চলার পথে অনুপ্রেরণা ও শক্তি। পৃথিবীতে সম্পর্কের সাথে মায়ের ভালোবাসার তুলনা করা যায় না। মা হলেন সন্তানের নিরাপত্তার আশ্রয় বিপদে-আপদে, দুঃখ-ব্যথা সব পরিস্থিতিতে মা সন্তানকে আগলে রাখেন। সাধ্বী মাদার তেরেসা হলেন সবার মা ও তাকে 'মাদার' উপাধি দেওয়া হয়েছে, যা সঠিক ও গ্রহণযোগ্য। মাদার তেরেসা আমাদের গর্ভধারী মা না হলেও তিনি আমাদের সবার মা ও প্রকৃত মায়ের আদর্শ। পবিত্র আত্মার এই মহান কাজ ও ঐশ পরিকল্পনা হলো শত শত অনাথ, গরীব-অসহায় শিশুরা যে, ঈশ্বরের সন্তান তাদের জীবন রক্ষার জন্য, ঈশ্বর এবং পিতা-মাতাদের ভালোবাসা, স্নেহ পাওয়ার জন্য ঐশ ইচ্ছায় মাদার তেরেসা সবার মা হয়েছেন। সেইজন্য আমরা সকলে মাদার তেরেসাকে মা হিসেবে গ্রহণ করে থাকি। যাদের মা নেই তাদের মা হলেন মাদার তেরেসা। কিন্তু ঈশ্বর আমার জন্য আমার মাকে দিয়েছেন। তিনি শুধু আমার মা। মা যখন একটি সন্তানকে জন্ম দিয়ে থাকেন, তখন যদি একজন বাবা পাশে না থাকেন, তখন সেই সন্তান 'গর্বের' হয় না। সেই জন্য আমাদের জীবনে বাবা ও মায়ের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

"মায়ের প্রতি ভালোবাসা" শুধুমাত্র মুখের কথা নয়, বরং তাকে সময় দেওয়া, যত্ন নেওয়া, তার ভালো লাগার কাজগুলো একসাথে করা এবং প্রতিটি মুহূর্তে তাকে বিশেষ অনুভব করানো। মাতৃহীন শিশুদেরও নিজের মায়ের মতোই ভালোবাসা ও স্নেহ দেওয়া উচিত। মায়ের প্রতি ভালোবাসা হলো নিঃস্বার্থ, শর্তহীন এবং চিরন্তন, যা পৃথিবীর সব কিছুর উর্ধ্বে। মা জীবনের প্রথম শিক্ষক, বন্ধু এবং শ্রেষ্ঠ আশ্রয়, যার স্নেহের সাথে কোন কিছুর তুলনা হয় না। প্রতিদিন মাকে সময় দেওয়া, যত্ন নেওয়া এবং ছোট ছোট কাজে মায়ের এই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো উচিত, শুধু বিশেষ কোন দিনে নয়। মা পাবে মায়ের স্বীকৃতি ও বেঁচে থাকার আশা। 'মা' দিবসে আমাদের সকলে প্রার্থনা করি যেন সকল মা ভালো থাকেন ও মায়ের সম্মান নিয়ে সকল নারী যেন বেঁচে থাকে আত্মমর্যাদায়।

মানব সেবায় ধৈর্যশীল ও নিবেদিত প্রাণ

মিনু গরেট্টী কোড়াইয়া

মেয়েরা মায়ের জাত, সেবার মনোভাব তাদের সহজাত স্বভাব। সংসারে একজন নারী যেমন সকলের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন তেমনি নার্সিং পেশার মধ্য দিয়েও তারা অসুস্থ পীড়িত মানুষের সেবা করে মানবতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। বিশ্ব খ্যাত ইংরেজ নার্স "ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল" যিনি ছিলেন নার্সিং পেশার অগ্রদূত, তিনি ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে ক্রিমিয়ান যুদ্ধে আহত সৈন্যদের সেবায় নেতৃত্ব দেন এবং পরবর্তীতে তিনি আধুনিক নার্সিংয়ের ভিত্তি স্থাপন করেন। তার অবদান আজও সারা পৃথিবীতে নার্সিং পেশায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

মানব সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য আর আত্মতৃপ্তি রয়েছে সেবার মধ্যে। এই সেবা একটি পেশা এবং জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম হলেও এর সাথে জড়িয়ে আছে আর্ত মানবতার প্রতিচ্ছবি। এই সেবার সাথে নার্সদের আত্মনিয়োগ এমনভাবে জড়িয়ে থাকে যা অন্যান্য কাজের চেয়ে তাকে অধিক গুণে গুণান্বিত করে তোলে। অসীম ধৈর্য আর মানসিকতা নিয়ে তারা এই ব্রত গ্রহণ করে থাকেন যা আমরা সাধারণ মানুষের ধৈর্যে কুলাবে না। অর্থের বিনিময়ে নার্সরা এই কাজে নিয়োজিত হলেও তাদের মনের মধ্যে উদার মনোবৃত্তির আলাদা একটি সত্তার জন্ম নেয় যা দয়ার মনোভাব ও যত্নশীলতার মাধুর্য দিয়ে সেবামূলক এই পেশাকে আরও গর্বিত করে। তারা তাদের জীবনের পুরোটাই এই সেবা কাজের জন্য উৎসর্গ করে থাকেন। রোগীকে ওষুধ খাওয়ানো থেকে শুরু করে রোগীর স্বাস্থ্য সেবার প্রায় সব কাজ করেন নার্সরা। তাদের সেবার মূল্য অর্থ দিয়েও শোধ করা যাবে না।

একজন নার্স আমাদের জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তির পর ডাক্তারের পরে আমরা নার্সের উপর ভরসা করে থাকি। তারা পরম যত্ন আর ভালোবাসায় অসুস্থ মানুষটির সেবা করে যান, ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী রোগীর ওষুধ পথ্য এবং সব রকমের পরামর্শ তারা দিয়ে থাকেন। তাদের উপর ভরসা রেখে রোগী ও তার আত্মীয় পরিজন নির্ভয়ের নিঃশ্বাস ফেলেন। তাদের আমরা ঈশ্বরের পরম দূত হিসেবেও চিহ্নিত করি।

একটা সময় নার্সিং পেশাতে মানুষের অনিহা ও অনাগ্রহ ছিলো এই পেশাকে সমাজে বিবেচিত হতো ছোট কাজ হিসেবে। অনেক অভিভাবক এটিকে অসম্মানের এবং লজ্জাকর কাজ হিসেবেও দেখতো যার কারণে সন্তানকে এই পেশায় আসতে দিতো না। ধীরে ধীরে মানুষের ভ্রান্ত ধারণা ও মানসিকতারও উন্নতি হয়েছে, মহান এই পেশার প্রতি মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে। প্রথমে নার্সিংয়ের প্রাথমিক শিক্ষাটা শুধুমাত্র নারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও বর্তমানে তা নারী-পুরুষ উভয়ই এটিকে পেশা ও সেবার মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন। আমাদের সমাজে অধিকাংশ শিক্ষিত নারীরা চাকরীর অভাবে বেকার জীবন যাপন করে, অথচ নার্সিং পেশার জন্য তিন/চারবছর প্রশিক্ষণ নিতে পারলে যে কোনো হাসপাতালে চাকরীর নিশ্চয়তা পাওয়া যায়, যা তাদের জীবন মান উন্নত করে, মানসিক শান্তি ও অর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পায়।

অসুস্থ পীড়িত মানুষজন হাসপাতালে ছুটে যান বাঁচার আশায়। যেখানে ডাক্তারের পর নার্সরাই ঐ অসুস্থ মানুষের কাছে প্রভু হয়ে ওঠেন। তাদের সেবা ও ব্যবহারে অসুস্থ মানুষ অনেকাংশেই সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং মানসিক শক্তি ফিরে পান। পৃথিবীতে এই একটি মাত্র কাজের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের পাশাপাশি মানব সেবার সুযোগ পাওয়া যায়। ধৈর্যশীল ও নিবেদিত প্রাণ হওয়ার মাধ্যমে এই কাজের সম্মান ধরে রাখার চেষ্টা থাকুক সকল সেবাদানকারী নার্সদের মধ্যে।

আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন

আমি ভিকি হালদার।
গ্রাম- পূর্ব রাজাশন
থানা- সাভার, জেলা- ঢাকা
ধরেন্ডা মিশনের অধিবাসী।

আমার স্ত্রীর নাম লিলি স্কলাষ্টিকা গমেজ আমি তিন মাস যাবৎ পায়ের অসহ্য যন্ত্রনায় মৃত্যুর দিন গুনছি। ডাক্তার বলেছেন আমার পা কাটতে হবে। বর্তমানে অর্থের অভাবে আমার চিকিৎসা করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

তাই আপনাদের প্রার্থনা ও আর্থিক সাহায্য একান্তভাবে যাচ্না করছি।

আর্থিক সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা

ভিকি হালদার
মোবাইল নং ০১৮৩৩-৬৮৫৫৬৪
(বিকাশ ও নগদ)

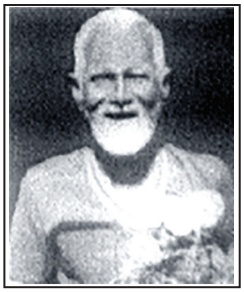

৩৯তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত পল পালমা

জন্ম : ০২ ডিসেম্বর, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ০৩ মে, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ
দক্ষিণ ভাদার্ত্তী, তুমিলিয়া মিশন

দেখতে দেখতে ৩৯টি বছর পার হয়ে গেল। যদিও আজ তুমি নেই তবু আমাদের জীবনে তোমার অভাব এখনও প্রকট। প্রার্থনা করি পরম পিতার কাছে তুমি শান্তিতে থেকে আমাদেরকে আশীর্বাদ করবে যেন, তোমার আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হই। ঈশ্বর তোমার আত্মাকে অনন্তধামে চিরশান্তি প্রদান করুন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

প্রয়াত (স্ত্রী) : ডরথী আর. পালমা
ছেলে-ছেলে বৌ : সুজিত-রত্না, সুধীর-ওয়েস্তি
মেয়ে-মেয়ে জামাই : পাস্কা-মৃত জেম্স অরুণ, মালতী-জন, রীনা-পরিমল, রীটা-মাইকেল
নাতি-নাতনী : রনা, অংকন, অর্পণ, শাওন, তুরী, বেনডেন, ইলেন, স্তুতি, আর্চি ও এমিলিন পালমা।

বিজ্ঞ/১০১/২৬

কি করে তাঁকে ভুলে যাই

ড. ইসিদোর গমেজ

এই মানুষটিকে আমরা ক'জন মনে রেখেছি? যারা তাঁকে চিনতাম, জানতাম তারাও প্রকৃতির নিয়মে ভুলতে বসেছি। আমি কেন জানি তাঁকে ভুলতে পারি না। মাঝে মাঝে তাঁর অনুপস্থিতি আমাকে আমার অযোগ্যতা মনে করিয়ে দেয়। আমরা সমাজের কত সমাজ নেতা, ধর্মগুরু, সমবায় নেতা, রাজনীতিবিদদের জন্মতিথি বা প্রয়াণদিবস পালন করি। কিন্তু তাঁর মত একজন সর্বাঙ্গীন ভদ্রলোক, শিক্ষক-গবেষককে নিয়ে কোন কথা বলছি না। কারণ, তিনি তো ছিলেন একজন "লেম্যান" বা "সাধারন খ্রিস্টভক্ত"! অথচ তিনি ছিলেন বাংলাদেশের অনেক ছাত্র ছাত্রীর উচ্চশিক্ষার অনুপ্রেরণা। আমি হাইস্কুলের গণ্ডি পেরোনোর আগেই তিনি পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেছিলেন। সংবাদটি আমাদের সেই সময়কার সমাজে বিশেষভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সত্যিই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। স্থানীয়ভাবে তাঁকে সম্মান জানানো হয়েছিল। তখনই আমি ঠিক করেছিলাম, এই মানুষটির মতো আমাকেও পড়ালেখা করে বড় হতে হবে। পরে তাঁর সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়েছিল আমার। একদিন আমাদের এলাকার একজন ধর্মগুরু তাঁর নাম ধরে বলেছিলেন, ড. বেনেডিক্ট আমাদের মণ্ডলীর জন্য কি করেছেন? আমি তাঁর এহেন মন্তব্যে শুধু দুঃখ পেয়েছি। মনে মনে বলেছি, সময় আসুক, একদিন তাঁর বিশালতার কথা লিখে জানাবো, তিনি নিজে কিভাবে খ্রিস্টকে ধারণ করতেন! আজ তাই চেষ্টা করছি, তাঁর সম্পর্কে আরও জানার ও শেখার।

তাঁর নাম, বেনেডিক্ট গমেজ বা বেনী ভূরা। খ্রিস্টান সমাজে সমধিক পরিচিত ডক্টর বেনেডিক্ট গমেজ হিসেবে। অর্থাৎ প্রফেসর ড. বেনেডিক্ট গমেজ। বলতে লজ্জা বোধ করি, আমাদের অনেক খ্রিস্টান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং শিক্ষকগণ জানেন না একটা বেসরকারী কলেজের প্রফেসর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরের মধ্যে কি পার্থক্য! তারা এও জানতে চায় না যে একটি "হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল এন্ড কলেজের প্রিন্সিপাল আর তেজগাঁও বা ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল এর পদমর্যাদায় কি পার্থক্য"। যাই হোক আজ আমি প্রফেসর ড. বেনেডিক্ট সম্পর্কে কিছু লিখছি, যেন আমরা এবং আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সন্তানরা জানতে পারেন তিনি কেমন মানুষ ছিলেন। চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে দেওতলা ও ছোটগোল্লা গ্রামে বেনেডিক্ট গমেজ-এর দাদা লাজারুস গমেজদের মত যুবকদের একটি বিশেষ গ্রুপ ছিল। যারা লেখাপড়ার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে শিশু কিশোরদের গান বাজনা, নাটক, খেলাধুলার মধ্য দিয়ে উৎসাহিত করতো এবং সবার জন্য বিনোদনের আয়োজন করতেন। এসব কাজে বেনেডিক্ট তাদের পিছনে পিছনে থেকে কাজ করেছেন এবং একসময় নিজেই গ্রামের যুবকদের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

বান্দুরা হলিক্রশ হাইস্কুলে পড়াকালীন তাঁর একটি দুঃসাহসিক ঘটনার কথা তিনি ভুলতে পারেন নি। সবাই জানে, মিশনারী স্কুলে রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ঐ সময় বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার তুমুল আন্দোলন চলছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। ঢাকাসহ সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল সেই আন্দোলনের ঢেউ। বেনেডিক্ট তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র। এর আঁচ তখনকার বান্দুরার মত গ্রামে-গঞ্জেও পৌঁছে গিয়েছিল। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় পুলিশের গুলিতে ছাত্র নিহত হবার খবর মুহূর্তে পৌঁছে যায় সারা দেশে। বান্দুরা হলিক্রশ স্কুলে খবরটা পৌঁছানোর সাথে সাথে বড় ক্লাশের ছাত্ররা উত্তেজনায় বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। বেনেডিক্ট বসতো প্রথম সারিতে। সে হঠাৎ দৌড়ে বের হয়ে যায় এবং স্কুলে ছুটির ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সকল ছাত্ররা ক্লাশ থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে এবং তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল করে। হেড মাষ্টার ব্রাদারসহ সবাই অবাক বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিল। তবে, বাংলা ভাষার আন্দোলনে সমর্থন থাকায় বেনেডিক্ট গমেজকে কোন শাস্তি পেতে হয় নি। কারণ সেতো ছিল প্রথম সারির মেধাবী, বাধ্য ও বিনয়ী ছাত্র!

বেনেডিক্ট গমেজ ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে (চার্চ রেকর্ড অনুযায়ী ২২ মে, ১৯৩৩ খ্রি:) আঠারগ্রাম অঞ্চলের গোল্লা ধর্মপল্লীস্থ দেওতলা গ্রামের ভূরার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ডোমিঙ্গো গমেজ ও মাতা সাবিনা গমেজ। ডোমিঙ্গো-সাবিনা দম্পতির তিন সন্তানের মধ্যে বেনেডিক্ট দ্বিতীয়, বড় ছেলে লাজারুস গমেজ এবং সবার ছোট, মেয়ে জকিনা গমেজ।

বেনেডিক্ট গমেজ এর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় গোল্লা মিশন প্রাইমারী স্কুলে। সম্ভবত তিনি বান্দুরা হলিক্রশ স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁর প্রাথমিকের সহপাঠী বালিডিওর গ্রামের সর্দার বাড়ীর মারেস গমেজ সর্দার। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে মারেস গমেজ বলেছিলেন, "বেনী ভূরা ছিলেন ভালো ছাত্র। স্কুলে আমার পড়াশুনা করতে ভালো লাগতো না। গরুর ঘাস কাটতে ও পেন্সিল দিয়ে আঁকিজুকি করতে বেশি পছন্দ করতাম। দ্বিতীয় শ্রেণীই আমার শেষ ডিগ্রী। ভালো ছাত্র বেনীরা গোল্লা থেকে বান্দুরা হলিক্রশে ৩য়/৪র্থ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিল। একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, তৎকালীন সময়ে আমাদের মিশনারী স্কুলে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের পঞ্চম শ্রেণী পাশ করতেই ১৪/১৫ বছর বয়স হয়ে যেতো। উদাহরণস্বরূপ আমাদের নমস্য ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী তুখোর ছাত্র ছিলেন। কিন্তু কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করার সময় তাঁর বয়স ছিল কুড়ি বছর। বেনেডিক্ট গমেজ-এর শৈশব কেটেছে এলাকার আরো দশজন বালকের মতো। মা'কে কাজে সাহায্য করা, মাঠে ছুটাছুটি, খেলাধুলাসহ স্বাভাবিক দুরন্তপনা করে। তখনকার দিনে আমাদের খ্রিস্টান গ্রামগুলোতে ছেলেদের প্রিয় খেলা ছিল ফুটবল, দাড়িয়াবান্ধা, ডাঙগুলি, শুলনড়ি ইত্যাদি। শীত, বসন্ত আর গ্রীষ্মের কয়েকমাস ঘুড়ি ওড়ানো। গ্রামের প্রায় প্রতিটি বালক এসব খেলায় অংশগ্রহণ করতো। প্রায় প্রতিটি গ্রামে ও মিশনে একটি করে ফুটবল খেলার মাঠ ছিল। তবে হাসনাবাদ ও বান্দুরা স্কুলের মাঠ বাদে সকল গ্রামের মাঠ বর্ষাকালে পানিতে ডুবে যেত। অন্তত চার/পাঁচ মাস ছেলেরা মাঠে খেলাধুলা করতে পারতো না। জুন/জুলাই মাস থেকে সেপ্টেম্বর/অক্টোবর, চার/পাঁচ মাস গোল্লা, বালিডিওর, দেওতলা, কাশিনগর, তুইতাল, সোনাবাজুরের মত নীচু গ্রামের ছেলে, যুবক, বয়স্কদের সৌখিন কাজ ছিল মাছ ধরা। কেউ দুয়ারি/বৈচনা, কেউ বড়শিতে আবার কেউ কেউ ঝাকি জাল, কৈয়া জাল বা বড় বড় বানা দিয়ে মাছ শিকার করে নিজেদের ও পাড়াপড়শির প্রয়োজন মেটাতো। এতে একধরনের বিনোদনের বিষয়ও ছিল। বর্ষাকালে তুইতাল, দেওতলা, কাশিনগর, বালিডিওর, গোল্লা, সোনাবাজু গ্রামের ছেলে/মেয়েরা স্কুলে যেতো নৌকায়, নিজেরাই মাঝি। প্রতি নৌকায় ৪-৬ জন থাকতো। স্কুলে যাতায়াতের পথে নিজেদের মধ্যে বাইচ প্রতিযোগিতাও হতো। সেটি ছিল মহা আনন্দের। ড. বেনেডিক্ট তাঁর স্কুল জীবনে পড়ালেখার ফাঁকে ফাঁকে এসবই করেছেন।

বান্দুরা হলিক্রশ হাইস্কুলে বেনেডিক্ট গমেজ এর সহপাঠী খ্রিস্টান মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন এডুয়ার্ড গমেজ মাষ্টার (কাশিনগর) ও ফ্রান্সিস রোজারিও (শুলপুর)। তাঁরা সবাই ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেছিলেন এবং পরবর্তিতে পেশা জীবনে

উচ্চপদে আসীন হয়েছিলেন। বেনেডিক্ট গমেজ ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং ঢাকায় নটরডেম কলেজে ভর্তি হন। তখন কিন্তু বান্দুরা হলিক্রশ স্কুলে কোন বিজ্ঞান গ্রুপ ছিল না, সবাই আর্টস/মানবিকের। কলেজে এসে বিজ্ঞানে ভর্তি হলে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। তাই বেনেডিক্ট ভেবেছিলেন আর্টস নিলে পড়াশুনার পাশাপাশি কোন কাজ বা টিউশনি করতে পারবেন। কিন্তু তাঁর রেজাল্ট দেখে নটরডেম কলেজের প্রিন্সিপাল ফাদার তাকে বলেছিলেন, তোমার রেজাল্ট কত ভালো- তুমি সায়েন্স পড়বে। এরপর বেনেডিক্ট বিজ্ঞান গ্রুপে চলে যান। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের আইএসসি পরীক্ষায়ও তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ঐ বছরই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। বিএসসি তে তার প্রধান সাবজেক্ট ছিল- কেমিস্ট্রি, ফিজিওলজী এবং জ্যুওলোজী (প্রাণীবিদ্যা)। এখানে উল্লেখ্য যে, তখনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সব বিষয়ে অনার্স কোর্স ছিল না। এমনকি অনেক বিভাগের সৃষ্টিও হয় নি। আর সেজন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও বিএ/বিএসসি পাস কোর্স চালু ছিল। বেনেডিক্ট গমেজ যথারীতি পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে বিএসসি ডিগ্রী লাভ করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল ক্যাম্পাসে অবস্থিত বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগে এমএসসি-তে ভর্তি হন। তখন আমাদের দেশে বায়োকেমিস্ট্রি তুলনামূলকভাবে বিজ্ঞানের একটি নতুন বিষয়। ঐ বিভাগে তখনও অনার্স কোর্স চালু হয় নি। শুধু দুই বছরের মাস্টার্স কোর্স। ১৯৬২-৬৩ শিক্ষাবর্ষে বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগে প্রথম অনার্সে ভর্তি শুরু হয়। বেনেডিক্ট গমেজ ১৯৫৯ সনে মাস্টার্স ডিগ্রী পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস পান। আমার জানা মতে বেনেডিক্ট গমেজের আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোন খ্রিস্টান ছাত্র/ছাত্রী প্রথম শ্রেণী লাভ করে অনার্স বা মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করে নি।

ড. বেনেডিক্ট গমেজ ও স্ত্রী মার্থা

গান পরিবেশন করছেন ড. বেনেডিক্ট গমেজ

ড. বেনেডিক্ট গমেজ এর শিক্ষা জীবন সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা করার মূল উদ্দেশ্য হলো, তাঁর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের ধারাবাহিকতার বিষয়টি তুলে ধরা। বেনেডিক্ট গমেজ শুধু পড়ালেখা করে সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করেন নি। তিনি কিশোর বয়স থেকেই সমাজ ও যুব উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে বড়দের সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দেওতলা তরুন সংঘ (DTS) ক্লাবটি ১৯৩৫/১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হলেও ১৯৪৮/১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে যুবকদের নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সূচনা করা হয়। ফুটবল খেলা ও প্রতিবছর স্থানীয় ক্লাবগুলোর মধ্যে টুর্নামেন্টে প্রতিযোগীতার আয়োজন করা অনেক আগে থেকেই নিয়মিত ছিল। বেনেডিক্ট গমেজ এর পূর্বসূরী দক্ষ ও যোগ্য ক্লাব সংগঠক ছিলেন এডুয়ার্ড গমেজ খান, আন্তনী ডেপী গমেজ (ডেপী আন্তন), লাজারুস গমেজ ভূরাসহ আরও কয়েকজন। বেনেডিক্ট গমেজ ১৯৫১-১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে দেওতলা তরুন সংঘের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাঁর বন্ধু খেলার সাথী পি ডব্লিউ জার্মান গমেজ ভূরা লিখেছেন, "এডুয়ার্ড গমেজ খানের পর এক অসাধারণ নেতৃত্ব নিয়ে এগিয়ে আসেন বেনেডিক্ট গমেজ। তাঁর সময়েই তরুণ সংঘ উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হয়। তাঁর নেতৃত্বে শিক্ষা, সংস্কৃতি, খেলাধুলা, সর্বক্ষেত্রে দেওতলা তরুন সংঘ (DTS) এর উন্নতি সাধিত হয়। বেনেডিক্ট গমেজের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ক্লাবের প্রতিটি সদস্য কাজ করেছে। জার্মান ভূরা আরও বলেছেন, "ড. বেনেডিক্ট এর পাশাপাশি থেকে কাজ করার সুযোগ পেয়ে তার যেসব চারিত্রিক গুণের পরিচয় পেয়েছি তার তুলনা শুধু তিনি নিজেই।" সত্যিই সেই ছোটবেলা থেকেই বেনেডিক্ট গমেজ আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়ে এগিয়ে গেছেন। খেলাধুলা, সঙ্গীতে, নাটক অভিনয়ে-- কোথাও তিনি কম পারদর্শী ছিলেন না। হারমোনিয়াম বাজিয়ে তাঁর গান গাওয়া শুনে অনেকেই মন্তব্য করেছেন, তিনি তো অনেক বড় মাপের গায়ক হতে পারতেন। দেওতলা তরুণ সংঘে তার অনন্য অসাধারণ অবদান ছিল, ক্লাবের একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা। এর আগে এতদ্অঞ্চলের কোন সংঘ-সমিতির প্রাতিষ্ঠানিক কোন লাইব্রেরী ছিল না। এই লাইব্রেরী থেকে বই নিতে পার্শ্ববর্তী মিশনের মানুষ, বিশেষ করে ছাত্র-যুবারা আসতো। আমি নিজেও ১৯৬৭/৬৮ খ্রিস্টাব্দে দেওতলা তরুণ সংঘের লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে পড়েছি। জার্মান ভূরা বলেছেন, "ড. বেনেডিক্ট তাঁর জীবনাদর্শ দ্বারা তরুণ সংঘের ইতিহাসে দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী এক উজ্জ্বল নক্ষত্র--"।

ড. বেনেডিক্ট গমেজ এর শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো লিখতে গিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের কথা এখনও বলা হয় নি। বেনেডিক্ট গমেজের জীবন সঙ্গীনি নির্বাচন বিষয়টিও ছিল কিছুটা নাটক সংশ্লিষ্ট। লক্ষ্মীবাজার এলাকার একজন যুবতী মেয়ে বিমল গাঙ্গুলী, জন খাঁ, পল ডি' কস্তা, হেবল ডি' ক্রুজ গংদের সাথে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা শহরের ব্রিটিশ কাউন্সিল হলে পুরুষদের সাথে নাটকে অভিনয় করে খ্রিস্টান সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। নাটকটি ছিল, "কাশিনাথ"। ঐ নাটকে তিন জন মহিলা অভিনয় করেছিলেন। সেকালে নাটকে মেয়েদের চরিত্রে/ভূমিকায় মেয়েলী চেহারার যুবক/পুরুষরা অভিনয় করতো। আমাদের ফাদার/মুরুব্বিগণ ছেলেদের সাথে মেয়েদের একসাথে নাটক করার অনুমতি দিতেন না। যাই হোক বাংলাদেশ মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের সাথে বিশেষ দেন দরবার করে ছাত্র/চাকুরীজীবিরা নাটক মঞ্চস্থ করতেন। কাশিনাথ নাটকে অভিনয় করা মেয়েটির নাম ছিল মার্থা রোজারিও। তিনি ১৯৫৭ সালে সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার গার্লস স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরপর তেজগাঁও বটমলী স্কুলে শিক্ষকতা করছিলেন। সেই সময় একটি নাটকের রিহার্সাল চলছিল পাশের একটি বাড়িতে। ঐ রিহার্সালে আসতেন বেনেডিক্ট গমেজ এর দাদা লাজারুস গমেজ ভূরা। একদিন লাজারুস দাদা তার স্ত্রীকে নিয়ে এলেন রিহার্সালে। আর সেখানেই তাঁরা মার্থাকে পছন্দ করেন। তারপর স্বাভাবিক নিয়মে এগিয়ে চলে সবকিছু। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে বিয়ের সম্বন্ধ পাকা-পাকি (ডালা খাওয়া) হয়। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ অক্টোবর বেনেডিক্ট গমেজ ও মার্থা রোজারিও লক্ষ্মীবাজারস্থ হলি ক্রশ চার্চে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তারপর তারা দু'জনই শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন- একজন বিশ্ববিদ্যালয়ে, অন্যজন স্কুলে।

১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে যখন জানতে পারলাম আমাদের এলাকার একজন বেনেডিক্ট গমেজ

ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করে দেশে ফিরেছেন, তখন আঠারগ্রামের মানুষ বিশেষভাবে ছাত্র যুবাদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। এ অঞ্চলের প্রথম পিএইচডি ডিগ্রীধারী খ্রিস্টভক্ত। এর আগে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে পুরোহিত থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন দর্শন শাস্ত্রে। যেহেতু কখনো তাঁর নামের আগে তিনি ডক্টর লিখতেন না, সেজন্য এখনও শতকরা নব্বই জন খ্রিস্টভক্ত জানেন না যে, ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী শুধু প্রথম বাঙ্গালী বিশপ-আর্চবিশপই ছিলেন না, প্রকৃতপক্ষে তিনিই হলেন প্রথম পিএইচডি ডিগ্রীধারী বাঙ্গালী খ্রিস্টান। আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম কখন দেখবো ড. বেনেডিক্ট গমেজকে। ড. বেনেডিক্ট যেদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই থেকে ঢাকা ফিরে আসেন, তখন দেওতলা গ্রামের পক্ষ থেকে স্টিফেন গমেজসহ আরও কয়েকজন বিমান বন্দরে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানান। পরবর্তীতে তিনি গ্রামের বাড়িতে গেলে দেওতলা তরুন সংঘের মাঠে বিরাট আয়োজন করে তাঁকে আনুষ্ঠানিক সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। সেই অনুষ্ঠানে হাসনাবাদ, গোল্লা ও তুইতাল মিশনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এটি ছিলো সাধারণ খ্রিস্টভক্তদের পক্ষ থেকে আয়োজিত সম্বর্ধনা।

আমার দাদা যোসেফ গমেজ বান্দুরা হলিক্রশ হাই স্কুল থেকে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ম্যাট্রিক ও নটরডেম কলেজ থেকে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে আইএসসি উভয় পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেন। ডাক্তারী পড়ার বাসনা থাকলেও আর্থিক সঙ্গতি না থাকার কারণে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েও ভর্তি হতে পারেন নি। তবে তাঁর উচ্চশিক্ষা লাভের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল। তিনি জানতেন আঠারগ্রামের একজন, বান্দুরা হলিক্রশ স্কুল ও নটরডেম কলেজের এক্স স্টুডেন্ট বেনেডিক্ট গমেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগে শিক্ষকতা করছেন। তাঁকে অনুসরণ করে যোসেফ গমেজ উচ্চশিক্ষার পথ হিসেবে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগে বিএসসি অনার্সে ভর্তি হন। তিনিই বাঙ্গালী খ্রিস্টান ছাত্রদের মধ্যে প্রথম বায়োকেমিস্ট্রিতে অনার্সসহ মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেছিলেন। যোসেফ গমেজ বিভাগে ভর্তি হবার কিছুদিন পরেই জানতে পারলেন শিক্ষক বেনেডিক্ট গমেজ স্কলারশিপ নিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকার হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছেন। তিনিও স্থির করলেন, তাকেও বেনেডিক্ট গমেজ এর মত উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করতে হবে। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে যখন বেনেডিক্ট, ডক্টর বেনেডিক্ট গমেজ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় যোগদান করলেন, তখন যোসেফ গমেজ-এর অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রী সমাপ্তির পথে। যদিও যোসেফ গমেজের ভাগ্য হয়নি মহান শিক্ষক ড. বেনেডিক্ট গমেজ এর ক্লাশে অংশগ্রহণ করার, তথাপি তাঁর প্রতি ছিল অগাধ শ্রদ্ধা। তারা দু'জন পরস্পরকে ভালভাবেই জানতেন। তাকেই যোসেফ গমেজ উচ্চশিক্ষার আদর্শ ব্যক্তি বলে মনে করতেন। ফলে তিনিও (যোসেফ গমেজ) সরকারী স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে পড়াশোনা ও গবেষণা করে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে এনজাইম বায়োকেমিস্ট্রিতে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেছিলেন। ড. বেনেডিক্ট গমেজ এর পথ ধরে পরবর্তীকালে আরও কয়েকজন খ্রিস্টান ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগ থেকে অনার্স/মাস্টার্স ডিগ্রী করেছেন। এদের মধ্যে পল মিলন কস্তা, সিস্টার তেরেজা গমেজ, ড. সুব্রত বনেফাস গমেজ, খ্রিষ্টফার গমেজ ও ড. পল ফেবিয়ান গমেজের নাম উল্লেখযোগ্য। উপরের উদাহরণ থেকে নির্দ্বিধায় বলা যায়, ড. বেনেডিক্ট গমেজ ছিলেন বাংলাদেশে আমাদের খ্রিস্টান সমাজে উচ্চশিক্ষার পথ প্রদর্শক, আমাদের অনেকের আইকন।

শুধু উচ্চশিক্ষায় উদ্বুদ্ধকরণ নয়, ড. বেনেডিক্ট গমেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও যুব সংগঠন এবং মাণ্ডলিক কাজে জড়িত থেকে সেবা দিয়েছেন, দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, "ত্রিবেনী ছাত্র কল্যাণ সংঘ"। উইলিয়াম গমেজ, ভিনসেন্ট কেইন গমেজ, যোসেফ গমেজ, লরেন্স গমেজ, বেঞ্জামিন গমেজ, হিউবার্ট অরুন রোজারিও-দের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই সংঘের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন অধ্যাপক ড. বেনেডিক্ট গমেজ।

এই সংঘের প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন, যোসেফ গমেজ (পরবর্তীতে ড. যোসেফ), সেক্রেটারী লরেন্স গমেজ (পরবর্তীতে ড. লরেন্স গমেজ)। এখানে গর্বের সাথে উল্লেখ করতে হয়, তৎকালে ত্রিবেনী ছাত্র কল্যাণ সংঘে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাদের প্রায় সবাই উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশে বিদেশে উচ্চ পদে আসীন হয়েছেন। অনুরুপভাবে নতুন উদ্যোগে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত "আঠারগ্রাম খ্রিস্টান কল্যাণ সমিতি"র প্রথম প্রেসিডেন্টের (১৯৭২-১৯৮৫) দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন ড. বেনেডিক্ট গমেজ।

আমার এই লেখাটি কিছুটা আবেগ তাড়িত, তাই এখানে ধারাবাহিকতার বিচ্যুতি ঘটা স্বাভাবিক। ইতোমধ্যে আমি বেনেডিক্ট গমেজ-এর প্রাথমিক থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা জীবন সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করেছি। তিনি বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগ থেকে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে কৃতিত্বের সাথে মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন। পরীক্ষার রেজাল্ট প্রকাশের আগেই বেনেডিক্ট গমেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগে বিশেষ গবেষণা (এনালাইসিস অফ লিপিডস্) কাজের অফার পান এবং অক্টোবর ১৯৫৯ থেকে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট পর্যন্ত রিসার্চ ফেলো হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। এর পর সেপ্টেম্বর ১৯৬১ থেকে অক্টোবর ১৯৬২ পর্যন্ত সিনিয়র রিসার্চ ফেলো হিসাবে গবেষণা করেন। বিষয় ছিল, ফুড, ব্লাড ও ইউরিনের মধ্যে প্রোটিনস্, ভিটামিনস্ এবং মিনারেলস্ এর পরিমাণ এনালাইসিস সংক্রান্ত।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে বেনেডিক্ট গমেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগে লেকচারার হিসেবে যোগদান করে নিয়মিত শিক্ষকতা শুরু করেন। লেকচারার হিসেবে কর্মরত অবস্থায় তিনি ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বৃত্তি নিয়ে (EWC Scholar) হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়োকেমিস্ট্রি বিষয়ে প্রাক-পিএইচডি স্টাডি ও গবেষণা প্রোগ্রামে (সেপ্টেম্বর ১৯৬৪-জানুয়ারি ১৯৬৬) যোগদান করেন। অতঃপর তিনি হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে, হাওয়াই হার্ট এ্যাসোসিয়েশন ও এনআইএইচ স্কলার হিসেবে দুই বছর (জুলাই ১৯৬৬-জুন ১৯৬৮) এনজাইমোলজী বিষয়ে স্টাডি ও গবেষণা শেষ করে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। সাথে সাথে তিনি চার মাসের জন্য বিশেষ পোস্ট ডক্টরাল ফেলো হিসেবে হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের MAO রিসার্চ প্রকল্পে গবেষণা করেন।

পিএইচডি ডিগ্রী লাভ ও বিশেষ গবেষণা শেষ করে ড. বেনেডিক্ট বাংলাদেশে ফিরে তাঁর কর্মস্থল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট-এ পুনরায় যোগদান করেন। কয়েক মাস পর অর্থাৎ ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। এসময় তিনি অনার্স ও মাস্টার্স উভয় লেভেলের ক্লাশ নিতেন ও গবেষণাসহ থিসিস সুপারভাইস করতেন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে পদোন্নতি পান। তখন বায়োকেমিস্ট্রি পড়ানোর পাশাপাশি এনজাইমোলজী বিষয়ে গবেষণা ও থিসিস সুপারভাইজ করতেন।

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএও রিসার্চ সেন্টারে রিসার্চ এ্যাসোসিয়েট হিসেবে ডেপুটেশনে দুই বছরের জন্য গবেষণা করতে ঢাকা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই চলে যান। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি দেশে ফিরে আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে ড. বেনেডিক্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ

করেন। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাস হতে জুলাই ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একবছর তিনি যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টা অঙ্গরাজ্যের ইমোরি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে গবেষণা ও শিক্ষককতায় নিয়োজিত ছিলেন। এসময় তিনি আরও উচ্চতর মলেকিউলার লেভেলের (FAD Syntheses Research) এনজাইম বায়োমেডিকেমিক্যাল গবেষণা করেন এবং তার গবেষণা আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়। এরপর তিনি আবারও (১৯৮৫ জানুয়ারি-এপ্রিল ১৯৮৫ পর্যন্ত চার মাস) UN University Special Fellow হিসেবে যুক্তরাজ্যে ক্যামব্রিজ শহরে Dunn Nutritional Laboratories এ Nutritional Study & Methodology'র উপর গবেষণা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, ড. বেনেডিক্ট গমেজ (১৯৮৫-১৯৮৮খ্রিস্টাব্দ ৩ বছর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী শহীদুল্লাহ হলের আবাসিক শিক্ষক হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে প্রায় ৩ বছর (১৯৭৫-১৯৭৭) দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আমার জানা মতে ড. বেনেডিক্ট গমেজ প্রথম ব্যক্তি যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ প্রফেসর হয়েছিলেন। এর আগে মি. রবার্ট গমেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে রিডার (সহযোগী অধ্যাপক) হিসাবে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আমি প্রফেসর ড. বেনেডিক্ট গমেজ-এর উচ্চতর শিক্ষা, গবেষণার ও শিক্ষককতার বিষয়গুলো বিশেষ উদ্দেশ্যে উল্লেখ করেছি। কারণ এগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, তার শিক্ষা ও শিক্ষকতা জীবনে একটি সুন্দর ধারাবাহিকতা ছিল। তিনি কখনো তাঁর কক্ষচ্যুত হন নি, নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে এগিয়ে গেছেন তাঁর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে।

শিক্ষক হিসাবে কেমন ছিলেন ড. বেনেডিক্ট গমেজ? এ ব্যাপারে তাঁর প্রত্যক্ষ ছাত্র-ছাত্রী এবং সহকর্মীরাই ভালো বলতে পারবেন। তাঁর প্রত্যক্ষ খ্রিস্টান ছাত্রদের মধ্যে একজন হলেন, সিস্টার তেরেজা গমেজ আরএনডিএম আমার দিদি। যিনি বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগ থেকে এমএসসি করেছেন ১৯৭৪-৭৫ শিক্ষাবর্ষে। তার ভাষায় ড. বেনেডিক্ট গমেজ বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকদের চেয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত ছিলেন। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ, কোন বাড়তি কথা নয়, নির্দিষ্ট বিষয় পড়ানো, মাঝে মাঝে বলতেন, বুঝেছ? তখন নিজেই বুঝতে পারতেন সবাই বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি। তিনি আবার সহজ করে বুঝিয়ে দিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণত সিনিয়র শিক্ষকরা প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাশে থাকতেন না। ড. বেনেডিক্ট ছিলেন ব্যতিক্রম, তিনি ল্যাবরেটরিতে থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে কলমে এক্সপেরিমেন্ট শিখিয়ে দিতেন। ভুল করলে স্নেহমাখা কণ্ঠে আন্তরিকতার সাথে সাহায্য করতেন। ফলে শিক্ষার্থীরা তঁকে খুব ভালবাসত ও শ্রদ্ধা করতো।

আমার সৌভাগ্য হয়েছিল প্রফেসর ড. বেনেডিক্ট গমেজ এর সাথে হংকং এ অনুষ্ঠিত ফেডারেশন অফ এশিয়ান বিশপস কনফারেন্স-এর সাত দিনের (৫-১২ ডিসেম্বর ১৯৮৯) সেমিনারে অংশগ্রহণের। বিষয় ছিল, "বিজ্ঞান, ধর্ম ও বিশ্বাস" (Science, Religion and Faith)। বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর পক্ষে তিন জন অংশগ্রহণকারী ছিলেন ড. বেনেডিক্ট গমেজ, দিনাজপুরের বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ সিএসসি এবং আমি ড. ইসিদোর গমেজ। সেখানে অংশগ্রহণ করার আগে ঢাকায় ড. বেনেডিক্ট এর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসায় আমাকে নিয়ে তিনি বসেছিলেন, একটি কনসেপ্ট পেপার তৈরী করার জন্য। বিজ্ঞান, ধর্ম ও বিশ্বাসের ওপর, তখন তাঁর জ্ঞানের গভীরতা আমি অনুধাবন করেছিলাম। তাঁর সাথে আকাশ ভ্রমণ, সেমিনারে অংশগ্রহণ এবং অফ টাইমে শহর/মার্কেটে ঘুরে বেড়ানো ছিল অত্যন্ত আনন্দদায়ক। তাঁর ও বিশপ থিওটোনিয়াসের তুলনায় আমার জ্ঞানের পরিধি ছিল নগন্য। পেয়েছিম তাঁর স্নেহের পরশ।

ত্রিবেনী ছাত্র কল্যাণ সংঘের অনুষ্ঠানে তাকে আমন্ত্রণ জানালে তিনি পারতপক্ষে না করতেন না। তাঁর বক্তব্য ছিল সবসময় উৎসাহ ও অনুপ্রেরণামুলক। ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণে অনুপ্রাণিত করতেন। তবে তিনি কখনও নিয়মনীতির বাইরে গিয়ে অযোগ্য ছাত্র/ছাত্রীদের চাকুরী বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য সুপারিশ করতেন না। এজন্য তাঁর সম্পর্কে কেউ কেউ নেতিবাচক মন্তব্য করে থাকে। বলে, ড. বেনেডিক্ট আমাদের ছাত্রদের বা সমাজের জন্য কি করেছেন! হায়রে আমাদের সমাজ ও ব্যক্তি মূল্যায়ন। ড. বেনেডিক্ট কি তাঁর বিশ্ববিদ্যালযের পড়ানো ও গবেষণা ছেড়ে গ্রামে গিয়ে বিচার-সালিশ ও মানুষের জমি-জমার বিরোধ মেটাতে যাবেন? না কোন সমিতির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন? তারপরেও তাঁর পেশাগত দায়িত্বের বাইরে তিনি উপযুক্ত স্থানে সেবা দিয়েছেন অনেক।

তিনি নটরডেম কলেজ, হলিক্রশ কলেজ, সেন্ট গ্রেগরীস হাইস্কুল, বটমলী হোম হাইস্কুলসহ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির সদস্য/উপদেষ্টা থেকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। কোর-দি জুট ওয়ার্কস ট্রাস্টিবোর্ডের চেয়ারম্যান, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ এর উপদেষ্টা, কারিতাস বাংলাদেশ এর জেনারেল বডির সদস্য, বাংলাদেশ খ্রিষ্টান এডুকেশন কমিশন ও খ্রিস্টান ফ্যামিলি কমিশন এর সদস্য ছিলেন। রমনা প্যারিস কাউন্সিলের একজন সাধারণ সদস্য থেকে তিনি ধর্মপল্লীর জন্য সময় দিয়েছেন- এমনকি সাধারণ একজন খ্রিস্টভক্তের মত মিসায় পত্র পাঠ করেছেন।

ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর সাথে ড. বেনেডিক্ট গমেজ এর আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। ড. বেনেডিক্ট একজন একনিষ্ঠ খ্রিস্টভক্ত ছিলেন। পুরোহিত, ব্রাদার, সিস্টারদের তিনি যথাযথ সম্মান দিতেন। যুবক নবীন পুরোহিত/সিস্টারদের তিনি "আপনি" বলে সম্বোধন করতেন। অনেক অনুষ্ঠানে আর্চবিশপ গাঙ্গুলী, আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও, সিস্টার মেরিয়ান ট্রিজা, ফাদার টিম, ফাদার পিশোতো, ফাদার বেঞ্জামিন কস্তার মতো বিশিষ্ট ব্যক্তি পুরোহিতদের সাথে পাশাপাশি আসন গ্রহন করতে দেখা গেছে। আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলীর আকস্মিক মৃত্যুর পর ফাদার পৌল গমেজ, আলেকজান্ডার রোজারিও,

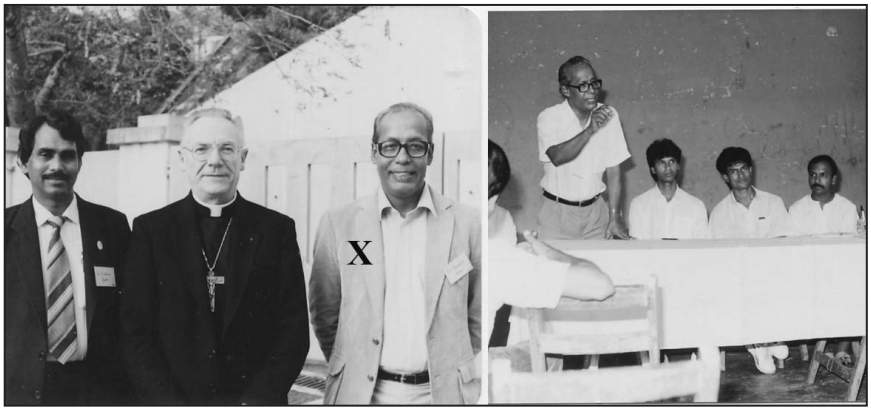

কার্ডিনাল পুঁপের সাথে ড. বেনেডিক্ট (ক্রস চিহ্নিত) (১৯৮৯) ত্রিবেনী ছাত্র কল্যাণ সংঘের সভায়

থিওটোনিয়াস মজুমদারদের উদ্যোগে ও আর্চবিশপ মাইকেলে রোজারিও'র সমর্থনে "আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট" গঠন করেছিলেন। তিনি ছিলেন ট্রাস্টের প্রথম ভাইস-প্রেসিডেন্ট।

বাংলাদেশ খ্রিস্টান ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠায় তিনি ছাত্র ও মণ্ডলীর নেতৃদের জন্য বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ খ্রিস্টান ছাত্রাবাস পরিচালনা কমিটির প্রথম প্রেসিডেন্ট (১৯৭৯-১৯৮৫)। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর একাডেমিক কাউন্সিলসহ বিভিন্ন কমিটির সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া তিনি তাঁর অধ্যাপনা ও গবেষণা সংশ্লিষ্ট অনেক প্রফেশনাল সোসাইটির সদস্য ছিলেন এবং জার্নাল প্রকাশনায় সংযুক্ত ছিলেন। এরমধ্যে, আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটি, নিউট্রিশন সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ফেডারেশন অফ এশিয়ান এন্ড ওশেসিয়ান বায়োকেমিস্ট্রি, বাংলাদেশ জার্নাল অফ নিউট্রেশন, সদস্য এডিটরিয়াল বোর্ড অফ বিএমআরসি, সদস্য বোর্ড অফ গভর্নস ইনস্টিটিউট অফ নিউট্রেশন, আমেরিকান ইউনিভার্সিটি এলামনাই এসোসিয়েশন, সেক্রেটারী জেনারেল অফ ইডব্লুসি এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রফেসর বেনেডিক্ট গমেজের একটি স্বপ্ন ছিল। সেটি তিনি পূরণ করতে পারেন নি। তাঁর প্রিয় বিদ্যাপিঠ নটরডেম কলেজকে তিনি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অর্থাৎ কলেজটিকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে রুপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই প্রচেষ্টায় আমিও সংযুক্ত হয়েছিলাম। ১৯৯১/৯২ খ্রিস্টাব্দের দিকে ড. বেনেডিক্ট এর আহ্বানে আমরা কয়েকজন, ফাদার পিশোতো, ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা, ড. বেনেডিক্ট গমেজ, ড. যোসেফ ডি সিলভাসহ বেশ কযেকবার আর্চবিশপ হাউসে এবং তাঁর বাসায় সভা করেছি। পরে আর একটু বৃহত্তর পরিসরে ড. বেনেডিক্ট আহ্বায়ক হিসেবে নটরডেম কলেজে মিটিং আহ্বান করেন। কিন্তু প্রফেসর ড. বেনেডিক্ট গমেজসহ আমাদের সেই সময়কার প্রচেষ্টা ও স্বপ্ন সেভাবে পূরণ না হলেও, কয়েক বছর হলো আমরা নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা পেয়েছি। তবে সেটির প্রতিষ্ঠা আমাদের উদ্যোগের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে নয়, ভিন্ন আঙ্গিকে এবং এখন নটরডেম কলেজ এবং নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয় দু'টি আলাদা সত্তা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত। দুঃখ একটাই ড. বেনেডিক্ট নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয়টি দেখে যেতে পারেন নি।

আমাদের দেশে ও সমাজে একজন প্রতাপশালী সরকারী কর্মকর্তা, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান, এমন কি রাজনীতিবিদও তাদের অবসর জীবনে একপ্রকার গুরুত্বহীন হয়ে পড়েন। চেয়ারে বা ক্ষমতায় থাকার সময় কতশত লোকের আনাগোনা, তদ্‌বির নিয়ে আসে পরিচিত অপরিচিত লোকজন, বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তি বা নেতাগণ। বিষয়টা আমাদের চার্চ, ব্যক্তি ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

ড. বেনেডিক্ট গমেজ ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসরে যান। এরপরও তিনি বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গবেষণা কাজে ও রিসার্চ পেপার রিভিউ করতেন। সামাজিক সংগঠনের অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ। এরপর বেশ কয়েকবছর তাঁর চলাচল সীমিত হয়ে পড়ে। অবশেষে এই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, আদর্শ খ্রিস্টবিশ্বাসী প্রফেসর ড. বেনেডিক্ট গমেজ ১৫ মে ২০১০ খ্রিস্টাব্দে অনন্তধামে গমন করেন।

আমাদের দেশের একটি ধারা বা কালচার হলো, জীবিতকালে একজন সম্মানীয় ব্যক্তি সম্পর্কে খুব কমই লিখা বা বলা হয়। তাঁর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় মৃত্যুর পর ঐ মানুষটির সান্নিধ্যে আসা ব্যক্তিবর্গ আত্মীয়-স্বজন, ছাত্র-শিক্ষক সহকর্মীদের কাছ থেকে। তেমনি ড. বেনেডিক্ট গমেজ ১৫ মে ২০১০ খ্রিস্টাব্দে পরলোকগমন করলে তাঁর অসংখ্য ভক্ত গুণগ্রাহী, বিশেষভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকদের কাছ থেকে শোকবার্তাসহ তাদের হৃদয়ের অনুভূতি প্রকাশিত হয় বিভিন্ন মাধ্যমে। এর থেকে দু'একটি বার্তা উল্লেখ করছি। প্রফেসর ড. বেনেডিক্ট গমেজ এর ছাত্র এবং পরবর্তীতে একই ডিপার্টমেন্টে সহকর্মী শিক্ষক *"গোমেজ স্যারের স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি"* নিবেদন করতে যা লিখেছিলেন :

"লম্বায় বাংগালীর মত নন অথচ তামাটে-কালচে রঙের নির্ভুল বাঙালী, আবার মেদহীন ঝরঝরে দেহ নিয়ে অপরিচিত ভঙ্গিতে মাটি থেকে অনেকটা ওপরে তুলে পা ফেলে ফেলে হেঁটে যাওয়া লোকটির দিকে না তাকিয়ে পারা যায় না। কিছুক্ষণ পরেই দেখি লম্বা পায়ে অতিশয় দ্রুত গতিতে আমাদের ক্লাশে ঢুকে সময়ের অপচয় ও স্বর উঁচু না করেই হাসিমুখে অথচ হুঙ্কারের ভংগিতে সম্বোধন সবার প্রতি, "গুড মর্নিং!" জানালেন। আমরা ছাত্র ছাত্রীরা খুশি হব না ভয় পাব বুঝতে না পেরে পরস্পরের দিকে তাকালাম। ইতিমধ্যেই নিজের নাম বললেন, সবার অবগতির জন্য বোর্ডেও লিখলেন, বেনেডিক্ট গোমেজ, সংক্ষেপে বিজি। এ স্টাইলটিও আমাদের জন্য নতুন। উপস্থিতির খাতা খুলে দেখে, ঘাড় তুলে লম্বাটে মুখে আকর্ণ বিস্তৃত হাসি নিয়ে, ইচ্ছা করেই কোন অক্ষরে একটি য্য-ফলা যোগ করে যখন একেক জনের নাম ডাকা শুরু করলেন, আমরা আশ্বস্ত হলাম, তাঁকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। পড়ানোর সময় তাঁর মুখের ও শরীরের ভাষায় (বডি ল্যাঙ্গুয়েজ) তাপহীন একপ্রকার প্রচণ্ড শক্তির বিচ্ছুরণ আমরা দেখতে পেতাম। তখনকার শক্তিবর্ধক একটি টনিকের সুপরিচিত নাম, 'বিজি ফস' এর সাথে স্যারের সামঞ্জস্য আমরা অচিরেই আবিষ্কার করলাম। শিক্ষক হয়েও ছাত্রদের যে সম্মান করতে হয়, এই প্রথম তা'ও জানতে পারলাম।"

অন্য একজন লিখেছেন, "আমার সাথে পঁচিশ বছর পর দেখা প্রাণরসায়নের এক সহপাঠি আমিরুল করিমের বাসায়,---মনে পড়ে গেল, অনার্স মৌখিক পরীক্ষায় গোমেজ স্যার জিজ্ঞেস করেছিলেন গ্লাইকোজেন আর কোলাজেনের মাঝে পার্থক্য কি? বলতে আপত্তি নেই, জানা থাকলেও তাৎক্ষণিক উত্তর দিতে না পারায় ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। তা বুঝতে পেরে বের হয়ে অভয় দিয়ে বলেছিলেন, এটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না, গ্লাইকোজেন হচ্ছে শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট-শরীরের শক্তি যোগায়, আর কোলাজেন হচ্ছে আমিষ বা প্রোটিন- শরীরের বিভিন্ন পেশীকে জোড়া লাগিয়ে রাখে। উত্তরটি যে তোমার জানা তাতে আমার সন্দেহ নেই। সেদিন তাঁর এই চমৎকার সহমর্মীতায় মুগ্ধ হয়ে কিছুক্ষণ আগের ভয় আর অপমানের বোঝাটা নিমেষেই হালকা হয়ে গিয়েছিল।--- তিনি অন্য প্রসঙ্গে লিখেছেন, "গোমেজ স্যার যে একজন সঙ্গীত রসিক ছিলেন তখনই তা টের পেয়েছিলাম, কারণ পেশাদার দু'জন সংগীতজ্ঞের সাথে তিনিও একজন বিচারক ছিলেন। কিছুদিন পর শঙ্করের 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' বইটি ঢাকার বাজারে আসায় শীঘ্রই জানাজানি হয়ে যায় যে তিনি শুধু সঙ্গীতজ্ঞই নন, একজন খাঁটি বাঙালি সংস্কৃতির ধারকও বটে। নিজেদের আরো গর্বিত মনে হতো এই ভেবে যে, শংকরের মত উঁচুদরের লেখকের বইতে প্রশংসিত এক ব্যক্তি আমাদের শিক্ষক। তাঁর এই প্রতিভার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলাম আরো কিছুদিন পর। প্রাণরসায়ন বিভাগের সামনের খোলা জায়গায় আমাদের প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনে আরো চারজন শিক্ষকের সাথে তিনিও গাইলেন, 'আগুনের পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে, এ জীবন পূর্ণ করো--' ড. বেনেডিক্ট গমেজ ছিলেন অনেকেরই বিপরীত ধর্মী চরিত্রের। সদা হাসিমুখো, তাঁকে কোনদিন রাজা-উজির মারতে বা পরচর্চা করতে দেখিনি, কাউকে কটুবাক্য বলতে শুনিনি।"

নমস্য ড. বেনেডিক্ট গমেজ সম্পর্কে অনেক কথা বলার ইচ্ছা থাকলেও এই স্বল্প পরিসরে তা সম্ভব হচ্ছে না। পরিশেষে তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিনী মার্থা রোজারিও'র প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা, তাদের ছেলে-মেয়ে ও নাতি নাতনী সকলের কল্যাণ কামনা করছি এবং বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাচ্ছি আমাদের উচ্চশিক্ষার অনুপ্রেরণাদাতা পথ প্রদর্শক ড. বেনেডিক্ট গমেজের প্রতি।

(গত ১৪ সংখ্যার বাকি অংশ...)

বাউল সম্প্রদায় ও বাউল মতবাদ

জন ববি রোজারিও

আত্মজ্ঞানের ওপর বাউলদের এই যে গুরুত্বারোপ, তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় জ্ঞানগুরু সক্রেটিসের কথা। সক্রেটিস আত্মজ্ঞান ও চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের মহান ব্রতে উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর সমগ্র জীবন। তাঁর মতে, আত্মজ্ঞানার্জনই মানুষের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। আমরা জগতের প্রকৃতি, উৎপত্তি ও পরিণতি সম্পর্কে কিছুই জানি না, জানি শুধু আমাদের কী করা উচিত, কীভাবে আত্মার উৎকর্ষ সাধন করা যায় প্রভৃতি আত্মমূলক বিষয়কে। এ জ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞানই, মানুষের পরম কাম্য।

সুফিবাদ ও বৈষ্ণববাদ যেমন, বাউলবাদও তেমনি একটি প্রেমাত্মক দর্শন। বাউল মতে, প্রেমই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। নির্ভেজাল প্রেমানুভূতির মাধ্যমেই মানুষের পক্ষে সম্ভব আল্লাহ্‌র সন্ধানলাভ। এ প্রেম ভাবের পীরিত ও খোদার পীরিত এ দু'ভাগে বিভক্ত। ভাবের পীরিত বলতে বোঝায় সেই প্রেমকে যা কিনা মানুষকে আকৃষ্ট করে জাগতিক বস্তু সম্পদের প্রতি। এ প্রেম মূলত দেহকেন্দ্রিক ক্ষণিকের প্রেম। তবে বিকাশের ক্রমিক প্রক্রিয়ায় এ প্রেমই পরিণতি লাভ করে লোকোত্তীর্ণ মিস্টিক প্রেমানুভূতিতে অর্থাৎ খোদার পীরিতে। এদিক থেকে ভাবের পীরিত, খোদার পীরিতের সোপানস্বরূপ। লালন শাহের মতে, আধ্যাত্মিক সাধকমাত্রকেই এই সোপন বেয়ে লাভ করতে হয় স্রষ্টার সান্নিধ্য।

বাউল মতে, আর্য-অনার্য, হিন্দু-মুসলমান, কোরআন-পুরাণে কোনো বিরোধ নেই। যেমন: হিন্দু গুরুর মুসলমান শিষ্য এবং মুসলমান গুরুর হিন্দু সাগরেদ, হিন্দু বাউল রচিত গানে মক্কা-মদিনা ও রসুলের কথা এবং মুসলমান বাউল রচিত গানে হিন্দু দেব-দেবীর ও রাধাকৃষ্ণের উপমার কোনো কমতি নেই। মুসলমান ফকির, রসিক বৈষ্ণব ও হিন্দু বাউল একই তত্ত্বের, একই সাধন পদ্ধতির অনুসারী। বস্তুত, বাউলবাদের বিশেষত্ব নিহিত এর উদার অসাম্প্রদায়িক মানবিক ধ্যান-ধারণায়। এ মতে, আর্য-অনার্য, হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান কিংবা কোরআন-পুরাণে কোনো বিরোধ নেই। মুসলমান ফকির, রসিক বৈষ্ণব ও হিন্দু বাউল তাঁরা সবাই একই তত্ত্বের, একই সাধন-পদ্ধতির অনুসারী। সবচেয়ে বড় কথা, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষ একই বিশ্বমানবতার অন্তর্ভুক্ত। এ প্রসঙ্গে বাউলদের অতি পরিচিত ঘোষণা:

"নানান বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ
জগৎ ভরমিয়া দেখিলাম একই মায়ের পুত।"

দুনিয়ার সব মানুষ, সর্বজনীন ঐক্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব যে সব ধর্মেরই মূল শিক্ষা, সব অধ্যাত্মতত্ত্ব ও যথার্থ দর্শনের লক্ষ্যও যে এক ও অভিন্ন, তারই অভ্রান্ত ইঙ্গিত নিহিত বাউলদের এই দুই লাইনের অনবদ্য উচ্চারণে।

অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর কৃত "বাংলার বাউল ও বাউল গান" গ্রন্থে 'বাউল ধর্মের উপাদান' শীর্ষক অধ্যায়ে যে সব উপাদানের বর্ণনা দিয়েছেন সংক্ষেপে সেগুলি নিম্নরূপ –

১. বাউল ধর্ম বেদ-বহির্ভূত সাধনা: বাউল ধর্ম বেদ-বহির্ভূত। অন্য কথায়, বাউল ধর্ম কোন শ্রুতি. স্মৃতির উপর নির্ভর নয়। এটা কোন প্রচলিত ধর্মব্যবস্থা নয়। কিংবা এতে কোন ধর্মব্যবস্থার যাগযজ্ঞ, আচার-অনুষ্ঠান নেই। বাউলদের আচার, 'রাগের আচার', বেদের আচার নয়। বাউলরা কোন শাস্ত্র শাসনে বিশ্বাস করে না।

২. গুরুবাদ: বাউল সাধনা গুরুবাদী। গুহ্য বিষয়ে গুরু-শিষ্যের খোলাখুলি আলোচনা ও শিষ্যের প্রতি উপদেশ দান এই সাধনার অন্তর্গত। 'যারা সাধনার মাধ্যমে নিজেদের অভিজ্ঞতার দ্বারা আধ্যাত্মিক সত্য লাভ করেন তাঁরাই গুরু।' বাউল সাধনায় সাধন ক্রিয়ার গুরুত্ব সর্বোচ্চ। গুরু বলতে তাঁরা মানবগুরু বুঝেন তবে এই মানবগুরুকে আবার ঈশ্বররূপেও তারা কল্পনা করেন।

৩. স্থূল মানবদেহের গৌরব - ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডবাদ: বাউলরা মানবজীবন ও মানবদেহকে পরম মূল্যবান সম্পদ বলে গণ্য করেন। তাদের সাধনার মূল কেন্দ্র দেহ এবং তাঁদের মতে, দেহেই আত্মা বা ভগবানের বাস। দেহই তাদের আধ্যাত্মিক সাধনার কেন্দ্র। দেহের মধ্যেই 'মনের মানুষ', 'আলেখ সাঁই' বা পরম পুরুষের বাস। প্রেমমূলক সাধনার মূল আশ্রয়ই এর নরদেহ। বাউলরা বলেন, "যা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে" অর্থাৎ মানবদেহের বাইরে আর কিছু নেই।

৪. মনের মানুষ: বাউলরা মানব দেহস্থিত আত্মাকে মনের মানুষ বলে অভিহিত করে। তাদের মতে দেহের সাধনার দ্বারাই এই মনের মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। নিজকে চিনলেই এই মনের মানুষকে রচনা করা যায়। দেহের মধ্যেই তার ঠাঁই, অন্য কোথাও পরমাত্মা বিরাজ করে না।

৫. রূপ-স্বরূপ তত্ত্ব: বাউলদের মতে, রূপ বাইরের একটা আকারমাত্র। এই রূপের আশ্রয়ে অথচ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে সত্তার বাস সেটাই স্বরূপ। একজন সার্থক বাউল হলেন তিনি যিনি সাধনার মাধ্যমে পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনকে পরিপূর্ণ করে। এভাবে তিনি এমন এক অবস্থায় উন্নত হন যে অবস্থায় স্ব-সত্তার প্রকৃত রূপটি তিনি প্রত্যয়ন করতে সক্ষম হন। অর্থাৎ কেবলমাত্র আকারহীন মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে একটি চিরন্তন আকারহীন সত্তার মধ্যে বিলীন হয়ে স্বরূপ প্রাপ্ত হন।

বাউলদের সাধনার মূল উদ্দেশ্যই হলো রূপ থেকে স্বরূপে উত্তীর্ণ হওয়া। বাউলরা রাগপন্থী। কামাচার বা মিথুনাত্মক যোগসাধনাই হল বাউল পদ্ধতি।

বাউল সাধনা পদ্ধতি ও সাধনার উপাদান বিশ্লেষণ করার পর এখন এই সাধনার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা যাক। বাউল সাধনার মূলত তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে; যথাক্রমে: ১. আধিবিদ্যক বৈশিষ্ট্য; ইহজাগতিক অধ্যাত্মবাদ (Secular Spiritualism) ২. জ্ঞানবিদ্যক বৈশিষ্ট্য; মরমীবাদ (Mysticism) ৩. নীতিবিদ্যক বৈশিষ্ট্য; মানবতাবাদ (Humanism)। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

১) আধিবিদ্যক বৈশিষ্ট্য: ইহজাগতিক অধ্যাত্মবাদ (Secular Spiritualism): দর্শনের দিক থেকে বিচার করতে গেলে বাউল দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইহজাগতিক অধ্যাত্মবাদ। বাউলদের নিকট মানবদেহ হচ্ছে পরমতত্ত্ব বা পরম সত্য। এই দেহেই রয়েছে সকল জ্ঞানের, ধর্মের, কর্মের উৎস, উৎসাহ ও উদ্দেশ্য। মানব দেহেই পরমাত্মার বাস। এই দেহতেই কৈলাস, এই দেহতেই বৃন্দাবন, এই দেহতেই মক্কা/মদিনা। 'দেহ বিনা নাইরে উপায়' আর 'আপন ভাণ্ডে খুঁজলে পরে সকল জানা যায়।' এই ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডবাদের বাউলদের চরম ইহজাগতিক মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। পারলৌকিক চিন্তা-ভাবনার কোন ইঙ্গিত বাউলদের গানে পাওয়া যায় না। সাধন পদ্ধতিতেও পরলোকে স্বর্গপ্রাপ্তির কোন উল্লেখ নেই। বরং 'জ্যান্ত মরা' অবস্থাই চরম ও পরম প্রাপ্তি অবস্থা। এই জগত-জীবনের অবসানের পর কোন পরজগত-জীবন সম্পর্কে বাউলরা কোন ইঙ্গিত দেননি কোথাও। ***(চলবে)***

মায়ের শিক্ষা

মালা রিবেরু

বর্তমান বিশ্ব পরিবর্তনের হাওয়ায় ভাসছে। এ পরিবর্তনে সমাজের প্রতিটি স্তরেই লক্ষ্য করা যায়। পরিবেশগত পরিবর্তন, সমাজিক পরিবর্তন, পারিবারিক পরিবর্তন ও পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন যেন সর্বত্র পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে। ঠুনকো আঘাতে কাঁচের গ্লাস ভেঙ্গে যাওয়ার মতো সম্পর্কগুলো ভেঙ্গে যাচ্ছে। সামান্য স্বার্থের কারণে সম্পর্কগুলো একনিমিষে শেষ হয়ে যাচ্ছে। যাদের কারণে এই পৃথিবীতে আসা, যাদের ভালোবাসায়, আদরে লালিত পালিত হওয়া, যে মা-বাবা দিনের পর দিন রাতের ঘুম বিসর্জন দেয়, যাদের আত্মত্যাগে সন্তানদেরকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করা, পৃথিবীর সমস্ত সুখ পাওয়া কিন্তু দেখা যায় যে, পিতামাতা যখন বৃদ্ধ হয় তখন যদি সেই সন্তান মা-বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে অথবা অবহেলা করে এর চেয়ে কষ্টের-দুঃখের আর কিছুই থাকে না। কিন্তু পক্ষান্তরে এতকিছুর পরে দেখা যায় যে, মা-বাবা তার সন্তানের জন্য সবসময় ভালোটা কামনা করে।

এই পরিবর্তনের মাঝেও অবশ্যই কিছু ভালো ও ব্যতিক্রম আছে। দেখা যায় যে যার জন্য এই পৃথিবী এখনো সুন্দর আছে, অনেক মা-বাবা আনন্দ নিয়ে, পরিতৃপ্তি নিয়ে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে। এর সাক্ষ্য হলো মেঘলা। মেঘলা যে বছর এসএসসি পরীক্ষায় পাশ করে, তার পরীক্ষার ফলাফল বের হওয়ার তিনদিন পরেই ৯৫ বছর বয়সে তার ঠাকুরমা মারা যায়। মেঘলা দেখেছে, মৃত্যুর আগে গত পাঁচ বছর ঠাকুরমা বিছানায় ছিলো। মেঘলার বাবার আরও চার ভাই ও তাদের বৌ-সন্তানরা ছিলো। সবাই আলাদা সংসার করছিলো কিন্তু তার ঠাকুমা মেঘলাদের সাথেই ছিলো। অনেক আগেই মেঘলার ঠাকুরদাদা মারা যায়। এই পাঁচটা বছর ঠাকুরমা বিছানায় খাওয়া-দাওয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সব মেঘলার মা-বাবা'ই করেছে। মেঘলা দেখেছে তার মা এইসব কাজ করতে গিয়ে কোন অবহেলা বা অবজ্ঞা করেনি, এমনকি মেঘলা দেখেছে যে, গ্রামের বাড়িতে অনেক কাজের ঝামেলা; ঢেঁকিতে ধান ভানা, অনেকদূর অন্যের বাড়ি পানির কল থেকে পানি আনা ইত্যাদি সংসারের যাবতীয় কাজ করে বিকালের দিকে দুপুরের খাবার খাচ্ছে মেঘলার মা। এর মধ্যে ঠাকুমা বলতো "মেঘলার মা, আমি পায়খানা করবো।" মেঘলা ভাবতো মা সারাদিন পরে খেতে বসছে হয়তো মা রাগ করবে অথবা খাবার শেষ করে তারপর ঠাকুরমাকে পরিষ্কার করবে। কিন্তু না; মা কোন কথা না বলে আস্তে করে হাতটা ধুয়ে ঠাকুরমাকে পরিষ্কার করে আবার খেতে বসতো। মেঘলা সবকিছুই দেখতো তখন এতকিছু মাথায় আসতোনা, কিন্তু ঠাকুর প্রতি মায়ের দায়িত্ব পালন, সম্মান করা সবটাই মনে আছে।

আজ যখন মেঘলা তার বিবাহিত জীবনে তার ৯০ বছরের শয্যাশায়ী শাশুড়ীকে সেবা করছে তখন শুধু তার চোখের সামনে মাকে মনে পড়ছে। মা কিভাবে তার ঠাকুরমাকে যত্ন করেছে। ছোটবেলা দেখেছে তার ঠাকুরমা যখন চলাফেরা করতে পারতো তার কি অহংকার ছিলো, মার সাথে অনেক খারাপ ব্যবহার করতো। কিন্তু তার মাকে সে দেখেছে কোনদিন অবহেলা বা অপমান করে কোন কথা বলেনি। শেষের দিকে মেঘলার ঠাকুরমা কোন কথা বলতে পারতো না, শুধু মেঘলার মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকতো আর কান্না করতো। হয়তো নিজের কাজের জন্য অনুশোচনা করতো আর মনে মনে বলতো, আমার ব্যবহারে, কথার কারণে মা তুমি কষ্ট পেয়েছো, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও মা, আমি তোমাকে অনেক অনেক আশীর্বাদ করি মা; তুমি তোমার স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে অনেক সুখী হবে। এই বলে ছেলের বৌকে আশীর্বাদ করতো।

ঠাকুর মায়ের আশীর্বাদ হয়তো মা পেয়েছে, তাই সে স্বামী, সন্তান ও নাতি-নাতনী নিয়ে আনন্দেই আছে। একসময় যে থাকা, খাওয়া ও ভালো কাপড়, গহনা পড়তে পারেনি অভাবের জন্য; এখন সন্তানরা তার প্রতিটি শখ পূরণ করে দিয়েছে। যদি কোন কিছুর কথা বলে সঙ্গে সঙ্গে সন্তানরা নিয়ে চলে আসে।

মেঘলা এখন তার বৃদ্ধা শাশুড়ীর সেবা করতে গিয়ে তার মায়ের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়। তাই সে একদিন তার মাকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা মা, ঠাকুরমা তোমার সাথে অনেক খারাপ আচরণ করেছে, অনেক শখ থেকে বঞ্চিত করেছে, তার অন্যান্য ছেলের বউদের সামনে তোমাকে অনেক অপমান করেছে কিন্তু তুমি ঠাকুমার বৃদ্ধা বয়সে কোন অবহেলা করোনি বরং তুমি উল্টো সেবা করেছো। তোমার কি কোন খারাপ লাগেনি? মা তখন হাসি মুখে বললো, মা; তোমার ঠাকুরমা হচ্ছে আমার স্বামীর অর্থাৎ তোমার বাবার মা। সে অনেক কষ্ট করে তোমার বাবাকে ছোটবেলায় লালন করে প্রতিষ্ঠিত করেছে তার কারণে আমি তোমার বাবাকে পেয়েছি। প্রতিটি স্বামীর উচিত তার বউয়ের বাবা-মায়ের যত্ন নেওয়া এবং বউয়ের উচিত স্বামীর মা-বাবার যত্ন নেওয়া। এর পাশাপাশি অল্প বয়সে মা হারিয়েছি, তাই মায়ের আদরের লোভ সামলাতে পারি নাই। সংসার করতে গেলে অনেক মতের অমিল হতেই পারে। কিন্তু মা বলে ডাকার একজন মানুষ ছিলো। আমার মাকে তো কাছ থেকে এত যত্ন করতে পারি নাই। তাই তোমার ঠাকুর মাকে ভালোবেসে ও যত্ন করে অনেক শান্তি পেয়েছি। পাশাপাশি তার অনেক আশীর্বাদও পেয়েছি, তোমরা বোনেরা সবাই ভালো আছো, স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে ভালো করছো। সেই সাথে আমি ও তোমার বাবাও ভালো আছি। আমার দুইবার একসিডেন্ট হওয়ার পরেও সুস্থ আছি, সারাদিন কাজ করছি। মা তুমি আমার বড় সন্তান, তুমি যেরকম করবে তোমার বোনেরা ও তোমাকে অনুসরণ করবে। তোমার শাশুড়ীকে সেবা-যত্ন করলে, দেখবে তুমিও ভালো থাকবে পাশাপাশি আমরাও ভালো থাকবো।

মা

মিলন ডি'রোজারিও

ছোট একটা নাম
কত মধুর তার ডাক।
দুঃখ-কষ্ট মিলে মিশে
জড়িয়ে থাকে মিষ্টি মধুর হাক্।
বাবা-মায়ের ভালোবাসার ফসল হয়ে
সন্তান আসে বড় হতে থাকে যে
মায়ের অস্থি-মাংস ধারণ করে।
তখন থেকেই শুরু হয় মায়ের সাথে
সন্তানের নাড়ীর টান,
মা না খেলে অভুক্ত থাকবে
তার আদরের সোনামনি ধন।
দশ মাস গর্ভে রেখে সহ্য করে মা
সমস্ত কষ্ট যন্ত্রণা,
পৃথিবীর আলো বাতাস দেখাতে গিয়ে
মায়ের শুরু হয় প্রসব বেদনা।
এ কষ্ট লক্ষ কোটি টাকায়ও শোধ হয় না
সন্তানের মুখখানি দেখেই ভুলে যায় মা
সব দুঃখ যন্ত্রণা।

শেষ চিঠি

সবুজে ঘেরা একটি ছোট্ট গ্রামে থাকত নিলয় আর তার মা। নিলয়ের বাবা অনেক বছর আগে মারা গেছে। তারপর থেকে তার মা-ই ছিল তার পুরো পৃথিবী। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে তার মা অন্যের বাড়িতে কাজ করতে যেতো, আর রাতে ক্লান্ত শরীরে ফিরে এসে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে গল্প শুনিয়ে ঘুম পাড়াতো।

নিলয় ছোটবেলায় মাকে খুব ভালোবাসত। রাতে ঘুমানোর সময় মায়ের হাত না ধরলে তার ঘুমই আসত না। মা যদি একটু দূরে যেতেন, সে দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরত আর বলতো,

"মা, তুমি কোথায় গেলে?"

মা হাসতো আর মাথায় হাত বুলিয়ে বলতো,

"আমি তো তোমার কাছেই আছি বাবা।"

কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিলয় বড় হতে লাগল, আর তার মনও বদলাতে লাগল।

একদিন খবর এলো–নিলয় শহরে ভালো একটি কলেজে পড়ার সুযোগ পেয়েছে। পুরো গ্রাম খুশি, কিন্তু মায়ের চোখে আনন্দের সঙ্গে লুকানো দুঃখও ছিল। ছেলেকে কাছে না পেয়ে তিনি কীভাবে থাকবে?

যাওয়ার আগের রাতে মা চুপচাপ নিলয়ের কাপড় গুছিয়ে দিলো। পুরোনো একটি ব্যাগে সব কিছু রেখে শেষে নিজের আঁচলের কোণা থেকে কিছু ভাঁজ করা টাকা বের করলো।

"বাবা, এটা রাখ। বেশি না... কিন্তু আমার সঞ্চয়।"

নিলয় একটু অস্থির হয়ে বলল–

"মা, এত কষ্ট করে দিতে হবে না। আমি এখন নিজেই সামলাতে পারব।"

মা কিছু বললো না। শুধু মৃদু হেসে ছেলের মাথায় হাত রাখলো।

শহরে গিয়ে নিলয়ের জীবন পুরো বদলে গেল। নতুন বন্ধু, নতুন কলেজ, নতুন স্বপ্ন–সবকিছু তাকে ঘিরে ধরল। ধীরে ধীরে সে মাকে ভুল যেতে শুরু করল।

মা প্রতিদিন সন্ধ্যায় ফোনের পাশে বসে থাকতো। মাঝে মাঝে ফোনে নিলয়ের সাথে কথা বলতো,

"বাবা, খেয়েছিস? পড়াশোনা ঠিকমতো করছিস তো?"

নিলয় বিরক্ত হয়ে বলত–

"হ্যাঁ মা, সব ঠিক আছে। আমি এখন ব্যস্ত, পরে কথা বলব।"

তার এই ছোট ছোট কথাগুলোই মায়ের হৃদয়ে কাঁটার মতো বিঁধত। তবুও মা কখনো রাগ করতেন না। বরং ছেলের ভালো থাকার জন্য প্রতিদিন প্রার্থনা করতেন।

একদিন মা খুব যত্ন করে একটি চিঠি লিখলেন–

"বাবা নিলয়,

অনেকদিন তোর সঙ্গে ঠিকমতো কথা হয় না। তোর কণ্ঠ শুনতে খুব ইচ্ছে করে। মনে পড়ে, তুই ছোটবেলায় আমার হাত ধরে ঘুমাতি। এখন হয়তো বড় হয়ে গেছিস...

আমি ভালো আছি, তুই শুধু নিজের খেয়াল রাখিস।

তোর মা"

চিঠিটা পেয়ে নিলয় একটু আবেগাপ্লুত হয়েছিল, কিন্তু আবারও ব্যস্ততার অজুহাতে সব ভুলে গেল।

দিন যায়, মাস যায়...

হঠাৎ একদিন গ্রামের একজন লোক শহরে এসে নিলয়কে বলল–

"তোমার মা খুব অসুস্থ। বারবার তোমার নাম ধরছে।"

এই কথা শুনে নিলয়ের বুক ধক করে উঠল। সে সব কাজ ফেলে দৌড়ে গ্রামের পথে রওনা দিল।

কিন্তু বাড়ির উঠোনে পা রাখতেই সে বুঝতে পারল–সবকিছু শেষ হয়ে গেছে।

চারপাশে নিস্তব্ধতা। সবার চোখে জল। আর তার মা... নিথর হয়ে শুয়ে আছেন।

নিলয় চিৎকার করে উঠল–

"মা... আমি এসে গেছি! তুমি চোখ খোলো!"

কিন্তু মা আর কোনো উত্তর দিলেন না।

কাঁদতে কাঁদতে নিলয় ঘরের এক কোণে রাখা মায়ের পুরোনো বাক্সটি খুলল। ভেতরে ছিল তার ছোটবেলার জামা, খেলনা, আর অনেকগুলো চিঠি–সব তার নামে লেখা, কিন্তু কখনো পাঠানো হয়নি।

একটি চিঠিতে লেখা–

"আজ খুব অসুস্থ লাগছে। তোকে বলতে ইচ্ছে করে, কিন্তু ভাবি–তুই ব্যস্ত থাকিস... বিরক্ত করতে চাই না। তুই ভালো থাকলেই আমি ভালো।"

আরেকটি চিঠিতে–

"আজ তোর জন্মদিন। তুই পাশে নেই, তবুও আমি তোর জন্য পায়েস রান্না করেছি..."

এই লাইনগুলো পড়ে নিলয় ভেঙে পড়ল। তার চোখের জল থামছিল না।

সে মায়ের বিছানায় বসে কাঁদতে কাঁদতে বলল–

"মা, আমি ভুল করেছি... তোমার সঙ্গে একটু সময় কাটাতে পারলাম না... একবার শুধু ডাকো, মা..."

কিন্তু সময় আর ফিরে এলো না।

সেদিন নিলয় বুঝতে পারল–জীবনে যত বড়ই হও না কেন, মায়ের ভালোবাসার চেয়ে বড় কিছু নেই। আর সেই ভালোবাসাকে অবহেলা করলে একদিন এমন শূন্যতা তৈরি হয়, যা কোনোদিন পূরণ হয় না।

শিক্ষা: মা-বাবা আমাদের সবচেয়ে আপন মানুষ। তারা সবসময় আমাদের ভালো চান। তাই তাদের কথা মন দিয়ে শোনা, সময় দেওয়া এবং ভালোবাসা প্রকাশ করা খুবই জরুরি। কারণ সময় চলে গেলে সেই সুযোগ আর ফিরে আসে না। (সংগৃহিত)

ছোটদের জন্য মজাদার ধাঁধা

১) 'এক ঘরে জন্ম হয়,
দুই সহোদর ভাই।
মানুষের শরীর মাঝে,
এর দেখা পাই।'
উত্তর: চোখ।

২) 'এক গাছে হয় তিন তরকারি,
আজব কথা বলিহারি।'
উত্তর: কলাগাছ

৩) 'আসল ছেড়ে বছর গেল,
প্রাপ্তিযোগে কি ফল হল?'
উত্তর: আপেল।

৪) 'আছাড়ে হই না কাবু,
নই আমি ফুলবাবু।
টেপাটেপিতে মরণদশা,
আমি তো নই মশা।
ক্ষুধা লাগলে সবাই
হয়ে যায় পাগল,
আমাকে করতে জোগাড়
বাজারে নামে ঢল।'
উত্তর: ভাত।

৫) 'আগায় খস খস
গোড়ায় মৌ,
যে বলতে না পারবে
সে পবন ঠাকুরের বউ।'
উত্তর: আখ।

সংগৃহিত: ইন্টারনেট

আনন্দঘন পরিবেশে উদ্বোধন করা হলো রেভা. ফাদার চার্লস জে. ইয়াং ভবন

ডিসিনিউজ বিডি: ৩ মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার ফার্মগেট এলাকার আনন্দঘন পরিবেশ ও বিপুল উদ্দীপনা নিয়ে উদ্বোধন করা হলো ঢাকা ক্রেডিটের নতুন কর্পোরেট অফিস: রেভা. ফাদার চার্লস জে. ইয়াং ভবন। ২৬ পূর্ব তেজতুরীবাজারে দৃষ্টিনন্দন এই ভবন উদ্বোধন করেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আহমেদ আযম খান এমপি ও ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট মাইকেল জন গমেজ। সাথে উপস্থিত ছিলেন গেস্ট অব অনার ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের অবসরপ্রাপ্ত আর্চবিশপ কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি এবং সমবায় অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও নিবন্ধক মো: সেলিম ফকির এনডিসি। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়ের যুগ্ম-নিবন্ধক জনাব মো: কামরুজ্জামান, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের প্রেসিডেন্ট ও ঢাকা ক্রেডিটের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট নির্মল রোজারিও, দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ লি: (কালব)-এর চেয়ারম্যান আগষ্টিন পিউরীফিকেশন, ওয়ার্ল্ড ওয়াইএমসিএএস' এক্সিকিউটিভ মেম্বার ও ঢাকা ক্রেডিটের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বাবু মার্কুজ গমেজ, ঢাকা ক্রেডিটের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জেনারেল ইগ্নাসিউস হেমন্ত কোড়াইয়া'সহ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, উপদেষ্টা এবং সদস্যবৃন্দরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সমিতির সেক্রেটারি মঞ্জু মারীয়া পালমা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি আযম খান এমপি বলেন, 'আজ এই সমিতির চমৎকার ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দেখে আমি অনেক আনন্দিত ও মুগ্ধ হয়েছি। আমি আপনাদের সাথে সব সময় রয়েছি, সব সময় থাকবো। সবাইকে এই দিনে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।' অতঃপর মাইকেল জন গমেজ বলেন, 'আজ আমাদের জন্য একটি বিশেষ দিন। ৩ মে, ঢাকা ক্রেডিটের প্রতিষ্ঠাতা ও বাংলাদেশে ক্রেডিট ইউনিয়নের জনক ফাদার চার্লস জে. ইয়াং-এর ১২২তম জন্মবার্ষিকীতে ঢাকা ক্রেডিটের নতুন কর্পোরেট ভবন: রেভা. ফাদার চার্লস জে. ইয়াং ভবন উদ্বোধন করা হলো।' মো: সেলিম ফকির এনডিসি বলেন, 'রেভা. ফাদার চার্লস জে. ইয়াং ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে থাকতে পেরে আমি আনন্দিত। ১ লক্ষ ৭৫ হাজার সমবায় সমিতি রয়েছে, তার মধ্যে আপনারা একটি। এর মধ্যে ১ কোটি ২৮ লক্ষ সমবায় সমিতির সদস্য রয়েছে। এত বিপুল পরিমাণ সদস্যরা আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে একটি দেশের উন্নয়নের চিত্র বদলে দেওয়া সম্ভব।' এছাড়াও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ ঢাকা ক্রেডিটের কার্যক্রমের প্রশংসা এবং নতুন কর্পোরেট ভবন পরিদর্শন করে আনন্দ প্রকাশ করেন। এরপর প্রেসিডেন্ট, প্রধান অতিথি, গেস্ট অব অনার এবং অতিথিবৃন্দগণ বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে এবং ফিতা কেটে কর্পোরেট অফিসের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এ সময় কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও এবং ফাদার জেমস ক্রুশ পবিত্র জল সিঞ্চনের মাধ্যমে ভবনটি পবিত্রকরণ করেন। এছাড়াও ভবনটির উদ্বোধন উপলক্ষে বিশেষ স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন, ফাদার ইয়াং-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কেক কেটে আনন্দ উদ্‌যাপন করা হয়। অতঃপর ঢাকা ক্রেডিটের নারী বিষয়ক উপ-কমিটি, ঢাকা ক্রেডিট কর্মী ও ডিসি কালচারাল একাডেমির সমন্বয়ে সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে সমিতির ভাইস-প্রেসিডেন্ট শিপন রোজারিও সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সাধু যোসেফ সেমিনারীতে শ্রমিক সাধু যোসেফের পর্ব পালন

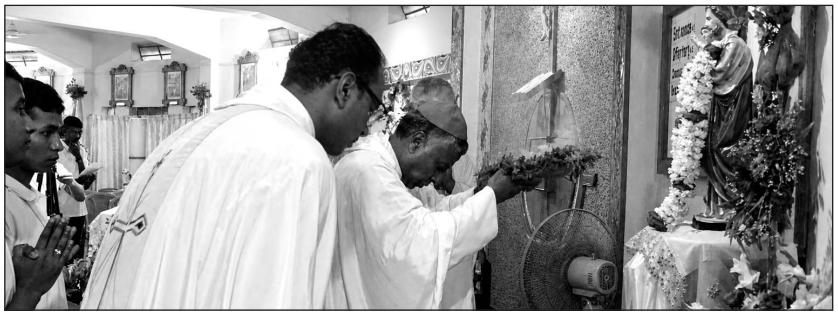

অপূর্ব রয়: গত ১ মে ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার রমনায় অবস্থিত সাধু যোসেফের সেমিনারীতে সেমিনারীর প্রতিপালক "শ্রমিক সাধু যোসেফের" পর্ব অত্যন্ত আনন্দ ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করা হয়। এই দিনটি খ্রিস্টানদের জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ সাধু যোসেফ সকল মানুষের আদর্শ ও প্রেরণার প্রতীক হিসেবে পরিচিত। এই পর্বীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ওএমআই, সেমিনারীর পরিচালকবৃন্দ, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ থেকে আগত যাজকবৃন্দ, সিস্টারগণ, নটরডেম কলেজ থেকে আগত প্রফেসরগণ, ঢাকা মহাপ্রদেশের শহর অঞ্চলের বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে আগত সম্মানিত খ্রিস্টভক্তগণ, সেমিনারীয়ানগণ এবং সেমিনারীর সহায়ক মণ্ডলী। শুরুতে আর্চবিশপ মহোদয় পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগে তিনি শ্রমিক সাধু যোসেফ এর জীবন, তাঁর বিনয়, পরিশ্রম ও বিশ্বাসের আদর্শ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, বর্তমান সমাজে শ্রমের মর্যাদা রক্ষা করা এবং সৎ ও পরিশ্রমী জীবনযাপন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পবিত্র খ্রিস্টযাগ শেষে উপস্থিত সকলের জন্য রাতের আহারের ব্যবস্থা করা হয়। এতে সবাই আনন্দের সাথে অংশগ্রহণ করেন এবং পারস্পারিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। সব মিলিয়ে দিনটি ছিল আনন্দ ও প্রার্থনাপূর্ণ। এই আয়োজনের মাধ্যমে সাধু যোসেফের প্রতি সকলের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল এনিমেটর কর্মশালা

সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ: বিগত ২৪ এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টবর্ষ রোজ শুক্রবার ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির উদ্যোগে "শিশুদের গঠনে এনিমেটরদের ভূমিকা" এই মূলসুরের উপর কাকরাইল আর্চবিশপ হাউজে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ঢাকা ও আঠারগ্রাম অঞ্চলের শিশু এনিমেটরদের নিয়ে দিবসব্যাপী এক ট্রেনিং কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ৫০জন এনিমেটর, ১০ জন সিস্টার এবং ৬ জন ফাদার অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালা শুরুতে ছিল নিবন্ধন, প্রাতঃরাশ ও পবিত্র খ্রিস্টযাগ। খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারী বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ এবং সহযোগিতা করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির পরিচালক ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া এবং ফাদার ঝলক আন্তনী দেশাই। খ্রিস্টযাগের উপদেশে বিশপ মহোদয় শিশু এনিমেটরদের শিশুমঙ্গল সংঘের মধ্য দিয়ে শিশুদের গঠন দানের জন্য প্রশংসা ও উৎসাহিত করেন এবং শৈশব থেকে শিশুদের খ্রিস্টীয় আদর্শে গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করেন। তিনি আরো বলেন, "মুখের কথা উড়ে যায়, কিন্তু জীবন আদর্শ রয়ে যায়।" তাই তিনি এনিমেটরদের জীবনাদর্শে শিশুদের সামনে তুলে ধরতে বলেন ও ঈশ্বরের বাণীর আলোতে পথ চলতে এবং যিশুকে ভালোবাসতে অনুপ্রাণিত করেন। এরপর ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া সবার উদ্দেশে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। শুভেচ্ছা বক্তব্যের পর কর্মশালার প্রধান বক্তা ডক্টর সিস্টার মেরী হেনরীয়েটা এসএমআরএ মূলসুরের উপর প্রজেক্টরের মাধ্যমে চমৎকার উপস্থাপনা রাখেন। টিফিন বিরতির পর যথারীতি ড: সিস্টার মেরী হেনরীয়েটা ২য় অধিবেশন শুরু করেন। এরপর দলীয় কাজের সুবিধার্থে সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ এর পরিচালনায় এনিমেটরদের ৪টি দলে ভাগ করা হয়। অতঃপর মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করা হয়। মধ্যাহ্ন ভোজের পর ২:৩০ মিনিটে এনিমেটরগণ ৪টি দলে বিভক্ত হয়ে সিস্টার মেরী হেনরীয়েটার প্রদত্ত প্রশ্নের উপর দলীয় আলোচনা করেন। এরপর ফাদার ঝলক আন্তনীর নেতৃত্বে এনিমেটরগণ দলীয় প্রতিবেদন পেশ করেন এবং দলভিত্তিক পরিচয় তুলে ধরেন। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির পক্ষ থেকে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পারিবারিক বাইবেল এবং বাইবেল (নতুন নিয়ম) উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়। কর্মশালাকে সার্থক ও সুন্দর করার জন্য ফাদার রিগেন কস্তা, ফাদার ঝলক আন্তনী দেশাই, মিসেস ঝর্ণা ক্রুশ এবং ব্লেয়ার রোজারিও সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতা করেন। পরিশেষে, ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া'র ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে দিবসব্যাপী শিশু এনিমেটর কর্মশালার শুভ সমাপ্তি ঘটে।

ধর্মহাটা ধর্মপল্লীতে শ্রমিক সাধু যোসেফের পর্ব উদ্‌যাপন

ফাদার জের্ভাস গাব্রিয়েল মুরমু: ১ মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লী'র অধীনস্থ ধর্মহাটায় সাধু যোসেফের গির্জায় শ্রমিক সাধু যোসেফের পর্ব উদ্‌যাপন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ও গির্জার পালপুরোহিত ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী, সহকারী পালপুরোহিত ফাদার জের্ভাস গাব্রিয়েল মুরমু, ফাদার স্বপন পিউরিফিকেশন, ফাদার শ্যামল গমেজ, ফাদার লিংকন কস্তা এবং খ্রিস্টভক্তগণ মিলিয়ে প্রায় তিনশজন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে সকাল ৯:৩০ মিনিটে সান্তালী নাচের মধ্যে দিয়ে ফাদারদ্বয় ও অতিথিবৃন্দ এবং খ্রিস্টভক্তজনগণকে অভ্যর্থনা জানানো হয় এবং ফাদারদ্বয়দের সম্মানসূচক পা ধোঁয়ানো এবং ফুল দিয়ে স্বাগতম ও অভিনন্দন জানানো হয়। শুরুতেই সকাল ১০টায় গির্জার প্রবেশদ্বার থেকে শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে পবিত্র খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্য করেন ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী। তিনি উপদেশ বাণীতে বলেন, "আমরা যেন শ্রমিক সাধু যোসেফের ন্যায় গুণ অর্জন করি। তিনি যেমন একাধারে বিশ্বস্ত, সৎ কর্মী ও সাধক ছিলেন, ঠিক তেমনি একজন খ্রিস্টভক্ত হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো সেগুলোকে অর্জন করা। তিনি আরো বলেন, সাধু যোসেফকে শ্রমজীবী মানুষের আদর্শ এবং প্রতিপালক হিসেবে গণ্য করা হয়, কারণ তিনি একজন কাঠমিস্ত্রী হিসেবে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে যিশু ও মাতা মারীয়াকে ভরণপোষণ করেছিলেন"। অতঃপর দুপুরে আহারের আয়োজন করা হয় এবং আহারের পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। শেষে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

শুলপুর ধর্মপল্লীতে নব বধুদের নিয়ে সাধ্বী আগ্নেশ সংঘের সূচনা

মিসেস শিল্পী গমেজ: গত ১ মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ রবিবার মহাসমারোহে পালপুরোহিত কমল কোড়াইয়ার অনুপ্রেরণায় যুবতী বউদের নিয়ে 'সাধ্বী আগ্নেশের সংঘ' নামে নতুন সংঘের যাত্রা শুরু হল। এই সংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল একত্রে মিলিত হয়ে পবিত্র খ্রিস্টীয় সমাজ গঠন, প্রার্থনা করা, একসাথে নির্মল বিনোদনে সময় কাটানো, সুস্থ-সুন্দর সামাজিক ও পারিবারিক জীবন গঠনে সহায়তা করা। ৬০জন সদস্যা সহকারী বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজের উপস্থিতিতে শপথ গ্রহণ করেন। এরপর পবিত্র খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারী বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ। বিশপ মহোদয় সংঘের সদস্যদের উদ্দেশে বলেন, "আজ হতে এ সংঘটি সমাজ ও মণ্ডলীর কাজে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে দলগতভাবে আরও উদ্যোগী হবে। তারা আরও পারস্পারিক সহযোগিতা-সহভাগিতার মধ্য দিয়ে শক্তিশালী হবে।" এ সংঘে যোগদানের মধ্য দিয়ে সদস্যাগণ পারিবারিক প্রার্থনা, মণ্ডলীর বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ, ও পরিবার জীবনে ভক্তি-বিশ্বাসের গঠনে ভূমিকা রাখবেন বলে বিশপ মহোদয় প্রত্যাশা রাখেন। খ্রিস্টযাগে নতুন সংঘের সদস্যাগণ প্রজ্বলিত মোমবাতি হাতে নিয়ে শপথ বাক্যপাঠ করেন।

অতঃপর খ্রিস্টযাগ শেষে নবগঠিত সংঘের পক্ষে বিশপ মহোদয় এবং পালপুরোহিতকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা-জ্ঞাপন করা হয়। সংঘের এনিমেটর সিস্টার মেরী এনরিকা এসএমআরএ ও মিসেস শিল্পী গমেজ নব গঠিত সংঘের সকল সদস্যাদের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়াদানের জন্য ধন্যবাদ জানান এবং সংঘের সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করে অনুষ্ঠান সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

মায়ের ১৫তম মৃত্যু বার্ষিকী

স্বর্গীয়া ফিলোমিনা কোড়াইয়া
জন্ম: ২২ জুন, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৩ মে, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

তোমারই স্নেহের সন্তানেরা,

দেখতে দেখতে সময় যে কিভাবে চলে যায়, তা বুঝা বড় মুশকিল। কালের আবর্তনে চলে গেল ১৫টি বছর। বিগত ১৩-০৫-২০১১ খ্রিস্টাব্দে আমাদের মা চলে গেছেন না ফেরার দেশে। তবুও মনে হয় মা আমাদের মাঝে তুমি এখনও আছো। যদিও আজ তুমি নেই আমাদের মাঝে। মা আমাদের মনে হয়, তুমি আছো সেই আগের মতো হাসিমাখা মুখখানি নিয়ে। মা তোমাকে এবং বাবাকে ভুলতে পারিনি। তুমি ও বাবা কত আদর ও ভালোবাসা দিয়ে আমাদের আগলে রেখেছিলে। আজো বার বার সামনে এসে ভাসে তোমাদের মুখোচ্ছবি। মা আমাদের মাঝে তোমার অভাব এখনও প্রকট। মা প্রতিদিন তোমার জন্য, বাবার জন্য এবং ভাই শ্যামলের জন্য প্রার্থনা করি। আমাদের বিশ্বাস তোমরা সবাই স্বর্গে আছো। আর স্বর্গে থেকে আমাদের জন্য প্রার্থনা করছো।

ঈশ্বর তোমার, বাবা ও ভাই শ্যামলের আত্মাকে অনন্তধামে চিরশান্তি প্রদান করুন।

তোমারই স্নেহের সন্তানেরা
জোনাস গমেজ ও পরিবার বর্গ।

বিজ্ঞ/১০০/২৬

চাকুরীর পুনঃবিজ্ঞপ্তি

৫ মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

এতদ্বারা হাসনাবাদ খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নোক্ত পদে কর্মী নিয়োগ করা হবে। যোগ্য প্রার্থীদের নির্দেশনা অনুযায়ী আবেদন করার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্র.নং	পদের নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্যান্য	বয়স সীমা	বেতন	লিঙ্গ
১	সহকারী একাউন্টস্ অফিসার	১। ব্যবসায় শাখায় স্নাতক ২। মাইক্রোসফট্ অফিসে পারদর্শী হতে হবে। ৩। যোগ্য প্রার্থীর ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য	অনধিক ৩০ বছর	প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী	পুরুষ
২	সহকারী লোন অফিসার	১। ব্যবসায় শাখায় স্নাতক ২। মাইক্রোসফট্ অফিসে পারদর্শী হতে হবে। ৩। যোগ্য প্রার্থীর ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য	অনধিক ৩০ বছর	”	পুরুষ/ মহিলা
৩	অফিস সহকারী	১। সর্বনিম্ন এইচ.এস.সি পাশ ২। যোগ্য প্রার্থীর ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য	অনধিক ৩০ বছর	”	পুরুষ
৪	প্রজেক্ট ম্যানেজার	১। কৃষি বিজ্ঞানে স্নাতক ২। মাইক্রোসফট্ অফিসে পারদর্শী হতে হবে। ৩। কৃষি, প্রাণী ও মৎস্য চাষে অভিজ্ঞতা থাকলে বয়স শিথিলযোগ্য	অনধিক ৪০ বছর	”	পুরুষ

আবেদন করার প্রক্রিয়াঃ
প্রার্থীর পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত, এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, সকল সনদের ফটোকপি এবং জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি সহ আগামী ৩১ মে, ২০২৬ খ্রি: এর মধ্যে সমিতির অফিসে জমা দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিঃ দ্রঃ প্রার্থীকে অবশ্যই হাসনাবাদ খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর একজন সদস্য/সদস্যা হতে হবে।

ধন্যবাদান্তে,

লিওনার্ড বার্নাড গমেজ
সি.ই.ও
হাসনাবাদ খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিজ্ঞ/৯৯/২৬

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

কারিতাস বাংলাদেশ একটি জাতীয়, স্থানীয় ও বেসরকারী অলাভজনক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, যা সমাজ কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে। কারিতাস বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় অফিসের অধীনে দুই জন পিয়ন আবশ্যক। উক্ত পদে আগ্রহী ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের (পুরুষ ও নারী) নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে। উক্ত পদের জন্য যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নিম্নরূপ:

পদের নাম ও শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অন্যান্য তথ্যাবলী	কাজের অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা
১) **পদের নাম: পিয়ন** **২) পদের সংখ্যা:** ২ (দুই) **৩) বয়স:** ২৫ - ৩৫ বছর (৩০/০৪/২০২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)। **৪) শিক্ষাগত যোগ্যতা :** ন্যূনতম এসএসসি পাস হতে হবে। **৫) কাজের ধরণ:** চুক্তি ভিত্তিক। **৬) নিয়োগের মেয়াদকাল:** প্রাথমিকভাবে নিয়োগের মেয়াদকাল ১ বছর, পরবর্তীতে কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে নিয়োগের মেয়াদকাল বর্ধিত করা যেতে পারে। **৭) বেতন/ ভাতা:** মাসিক সর্বসাকুল্যে ২২,০০০/- টাকা। **৮) উৎসব বোনাস:** প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী। **৯) দায়িত্ব:** ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা (প্রশাসন) এর নির্দেশে ও তত্ত্বাবধানে দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে হবে। **১০) কর্মস্থল:** প্রাথমিকভাবে কারিতাস কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তবে দায়িত্বের প্রয়োজনে দেশের যে কোন কারিতাস অফিসে যেতে হতে পারে। **১১) লিঙ্গ:** পুরুষ ও নারী।	• কোন প্রতিষ্ঠানে পিয়ন হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। • পরিশ্রমী, দায়িত্বশীল ও সৎ হতে হবে। • প্রয়োজনে অফিস কর্মঘন্টার পরেও কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। • গোপনীয়তা রক্ষা এবং প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালা মেনে চলতে হবে। **প্রধান দায়িত্বসমূহ:** • প্রতিদিন কর্ম দিবসে অফিসে সময়সূচী অনুযায়ী উপস্থিতি এবং দায়িত্ব প্রাপ্ত ফ্লোরের আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও গুছিয়ে রাখতে হবে। • অফিসের কাগজপত্র, ফাইল ও নথি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গুরুত্ব সহকারে পৌঁছে দেওয়া। • অফিসের দায়িত্ব প্রাপ্ত ফ্লোরে সকালে ও বিকালে নির্দিষ্ট সময়ে চা পরিবেশনসহ তৈজসপত্র নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সম্পাদন করা। • মিটিং রুমে প্রয়োজনে সহযোগিতা করা। • প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফটোকপি মেশিন চালানো ও ফটোকপি করা ও এতদা সংক্রান্ত নির্দেশনা মেনে চলা। • চিঠি বা ডকুমেন্টের গোপনীয়তা রক্ষা করা এবং অনুমতি ব্যতিত কোন ডকুমেন্ট ও চিঠি অন্য পক্ষকে হস্তান্তর না করা। • বিশেষ প্রয়োজনে কেয়ারটেকারকে বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করতে হবে। • অফিস চলাকালীন সময়ে কোথাও ব্যক্তিগত কারণে যেতে হলে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা (প্রশাসন) এর অনুমোদন সাপেক্ষে দায়িত্ব প্রাপ্ত কাজের জন্য বিকল্প ব্যক্তিকে দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ বুঝিয়ে দিয়ে যেতে হবে। • সব সময় বিনয়ী ও ভদ্র আচরণের সহিত সর্বোত্তম সেবা প্রদান করতে হবে। যে কোন অসৎ/ অশোভন আচরণ শাস্তিযোগ্য অপরাধী বলে গণ্য হবে। • কারিতাসের চাকুরী ও প্রশাসনিক নীতিমালার প্রতি অনুগত থাকতে হবে। • প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন যন্ত্রপাতি/সম্পদসমূহ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবেনা বা সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবেনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাজের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সম্পদসমূহ যত্নের সাথে ব্যবহার করতে হবে। • কারিতাসের শিশু ও বিপদাপন্ন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের সুরক্ষা নীতিমালায় বর্ণিত আচরণসমূহ সর্বদা পালন করতে বাধ্য থাকিবেন। শিশুর নিরাপত্তা এবং তাদের ক্ষমতায়নকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিতের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ থাকতে হবে। • আপনাকে অন্যান্য সহকর্মীদের সাথে সহযোগিতা করে কাজ করতে হবে এবং পেশাগত সম্পর্ক ও আচরণ বজায় রাখতে হবে । • প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ স্বার্থ রক্ষার জন্য আপনাকে নিরপেক্ষভাবে আপনার দায়িত্ব পালন করতে হবে। • চাকুরীতে থাকাকালে প্রাপ্ত অত্র প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত গোপনীয় তথ্যাদি কারো নিকট প্রকাশ করা যাবে না। চাকুরী হতে অব্যাহতির পরেও আপনাকে উক্ত গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে। • পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) অথবা অন্যান্য কেন্দ্রীয় পরিচালকবৃন্দ এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা (প্রশাসন) এর নির্দেশ মোতাবেক প্রদত্ত বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

আবেদনের শর্তাবলী :

১. ক) প্রার্থীর নাম, খ) পিতা/স্বামীর নাম, গ) মাতার নাম, ঘ) জন্ম তারিখ, ঙ) বর্তমান/যোগাযোগের ঠিকানা (মোবাইল ফোন নম্বরসহ), চ) স্থায়ী ঠিকানা, ছ) শিক্ষাগত যোগ্যতা, জ) ধর্ম, ঝ) জাতীয়তা, ঞ) আত্মীয় নয় এমন ২ জন ব্যক্তির Reference উল্লেখসহ সাদা কাগজে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর বরাবরে লিখিত আবেদন করতে হবে।

২. আবেদনপত্রের সাথে অবশ্যই শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের অনুলিপি, নাগরিক সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র চারিত্রিক সনদপত্র, ও সদ্য তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি জমা দিতে হবে। অভিজ্ঞতার স্বপক্ষে উপযুক্ত সার্টিফিকেট সংযুক্ত করা অত্যাবশ্যক।

৩. চাকুরীরত প্রার্থীকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র সংযোজন করে আবেদন করতে হবে।

৪. **ধুমপান, মদ ও নেশা দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নাই।**

৫. প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র যোগ্য প্রার্থীদের বর্তমান ঠিকানায় লিখিত এবং মৌখিক অংশগ্রহণের জন্য ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করা হবে। ব্যক্তিগত যোগাযোগ বা সুপারিশ প্রার্থীর অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।

৬. আবেদনপত্র আগামী ২১/০৫/২০২৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সহকারী ব্যবস্থাপক (মানব সম্পদ), কারিতাস কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ২ আউটার সার্কুলার রোড, শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭ ঠিকানায় ডাকযোগে/কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পৌঁছাতে হবে। পদের নাম খামের উপর স্পষ্ট করে লিখতে হবে।

৭. নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কারিতাসের সকল ধরনের পলিসি অনুসরণপূর্বক কাজ করতে হবে। ত্রুটিপূর্ণ/অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

৮. কারিতাস বাংলাদেশ সকল ব্যক্তির মর্যাদা এবং অধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিশেষভাবে, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর মর্যাদা ও অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদানে সর্বদা দায়বদ্ধ থাকতে সচেষ্ট। কারিতাস বাংলাদেশের বিভিন্ন কার্যক্রমে সকল প্রকল্প অংশগ্রহণকারী, শিশু, যুবা ও প্রাপ্ত বয়স্ক বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণের সুরক্ষার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েই বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর। কারিতাস বাংলাদেশ এর কোন কর্মী, প্রতিনিধি, অংশীদারদের দ্বারা শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্ক বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণের যেকোন ধরনের ক্ষতি, যৌন নির্যাতন, যৌন হয়রানি, যৌন নিপীড়ন ও শোষণমূলক কর্মকান্ড সংঘটিত হলে তা কারিতাস বাংলাদেশ এর শুন্য সহ্য নীতিমালায় (Zero Tolerance) বর্ণিত শাস্তির আওতাভুক্ত হবে।

"কারিতাস বাংলাদেশ কর্মী নিয়োগে সম-সুযোগদানে বিশ্বাসী"

বিজ্ঞ/১৮/২৬

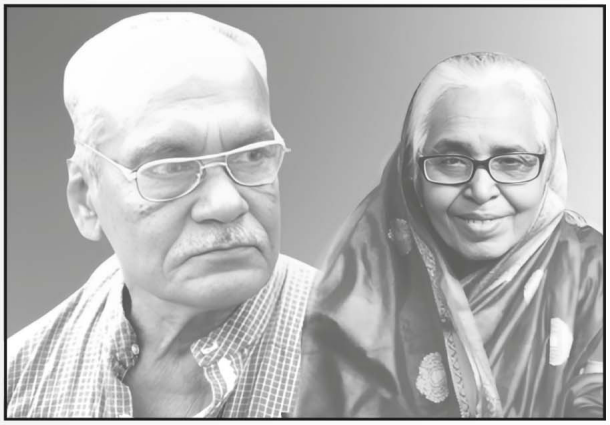

"মরণ সে তো শেষ নয়, ভক্ত প্রাণের নেইতো ক্ষয়। জীবন যাদের পুণ্যে ভরা, সবার তরে মরে যারা উদার প্রাণের বিনিময়ে তাঁরাই বেঁচে রয়"

প্রয়াত বার্ণার্ড গমেজ
আগমন: ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ
প্রস্থান: ৪ জুলাই, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত সবিতা আগ্নেস কস্তা
আগমন: ৮ জানুয়ারি, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ
প্রস্থান: ১৬ মে, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

প্রিয় বাবা ও মা,

নিয়তির বর্ষ পরিক্রমায় তোমাদের চিরবিদায়ের দিনটি প্রতিবছর এসে হাজির হয় আমাদের দ্বার প্রান্তে, হৃদয় গভীরে আরো বেশি করে অনুভব করি তোমাদের অনুপস্থিতির নিষ্ঠুর শূন্যতা। হাজারো মানুষের ভিড়ে আজও খুঁজি তোমাদের সেই আগলে রাখা ভালোবাসাপূর্ণ মুখগুলো। প্রতিদিন ভোর হয়, জেগে উঠি সবাই, কিন্তু তোমাদের তো আর জাগাতে পারলাম না! অনন্ত ঘুম তোমাদের সঙ্গী হলো। আমাদের জীবনে তোমরা ছিলে বটবৃক্ষের ছায়া, নিরাপদ আশ্রয়স্থল, জীবনাদর্শের উৎস, ভালোবাসার খনি। মৃত্যু জীবনের শেষ নয়, অনন্ত জীবনে প্রবেশদ্বার মাত্র। স্বর্গ থেকে আমাদের সকলের জন্য আশীর্বাদ করো, যেন তোমাদের রেখে যাওয়া খ্রিস্ট-বিশ্বাস, ভালোবাসা ও জীবনাদর্শে নিত্যদিন পথ চলতে পারি। পুনরুত্থানের আনন্দে অনন্তকাল পরম শান্তিতে থেকো পরম পিতার কোলে। আদর্শে, বিনম্র শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায় বেঁচে থেকো আমাদের সকলের হৃদয় মন্দিরে চিরকাল।

তোমাদের রেখে যাওয়া শোকার্ত–

ফুলমতি-রাণী-ফাদার তপন-রিপন-রুণা, সিস্টার রোজেন SMRA, চন্দন-লাকী-নিশীতা-নীলা, রঞ্জন-মমতা-কলিন্স-প্রিয়াংকা, ব্রাদার নির্মল CSC, কল্পনা-স্বপন-পুঁজা-কেয়া-কান্তা, লিটন-নীলা-অন্তর-জয়িতা এবং অপরাপর আত্মীয়, প্রতিবেশি, বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষী সকলে।

বিজ্ঞ/১৪/২৬

কানাডায় সুবর্ণ সুযোগ!

কানাডায় সরাসরি নিয়োগ: মিট প্রসেসিং ও এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কার

মিট প্রসেসিং জব (Saskatchewan, Manitoba, Alberta)

চিকেন, পর্ক এবং বিফ প্রসেসিং কোম্পানিতে কাজ।
- বেতন: শুরুতে ঘণ্টায় $১৬.৬০, এক মাস পর ভালো পারফরম্যান্সে $২০ পর্যন্ত হতে পারে।
- কাজের সময়: সপ্তাহে ৫০-৬০ ঘণ্টা।
- সুবিধা: মেডিকেল, লাইফ ও ডেন্টাল ইন্স্যুরেন্স, থাকার ব্যবস্থা এবং ইউনিফর্ম কোম্পানি প্রদান করবে।
- চুক্তির মেয়াদ: ২৪ মাস (রিনিউ করার সুযোগ আছে)।

ফ্রুট প্যাকার/এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কার (Kelowna, British Columbia)

ফল প্যাকিং এবং বাগান রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজ।
- সময়সীমা: জুন মাসের মাঝামাঝিতে অবশ্যই কানাডায় পৌঁছাতে হবে।
- যোগ্যতা: ভারী ওজন (৫০ পাউন্ড পর্যন্ত) বহন করার সক্ষমতা এবং যেকোনো আবহাওয়ায় কাজ করার মানসিকতা।
- শুধু পুরুষ প্রার্থীগন আবেদন করতে পারবেন।
- চুক্তির মেয়াদ: ২৪ মাস (রিনিউ করার সুযোগ আছে)।

বয়স: ২২ থেকে ৪৫ বছর / সাধারণ ইংরেজিতে কথা বলা ও লেখার দক্ষতা থাকতে হবে।

এছাড়াও জাপান, দক্ষিন কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, হাঙ্গেরি, রোমানিয়া সহ বিভিন্ন দেশে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম এবং ইংরেজি ভাষায় ব্যাচেলর্স / মাস্টার্স প্রোগ্রামে পড়াশোনার আকর্ষণীয় সুযোগ।

রোমানিয়ায় নিশ্চিত ওয়ার্ক - পারমিট এবং ভিসার দারুন সুযোগ সম্পর্কে জানতে আজই যোগাযোগ করুন

গ্লোবাল ভিলেজ একাডেমি
(আপনার স্বপ্ন পূরণের একান্ত সহযোগী)
হেড অফিস: বাড়ী # ১১, সড়ক # ২/ই, বারিধারা-জে ব্লক, ঢাকা-১২১২ (আমেরিকান দূতাবাসের পূর্বপাশে, বাঁশতলা বাসস্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
info@globalvillagebd.com

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ভিসা রিজেক্ট হলে কোনো টাকা কাটা হবে না, সম্পূর্ণ টাকা ফেরত দেওয়া হবে। (কানাডার ক্ষেত্রে)

+88 01827-945246
+88 01911-052103
+88 01718-885801
@globalvillageacademybd

বিজ্ঞ/১৫/২৬

বর্ষ ৮৬ ❖ সংখ্যা - ১৫
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 15
Regd. No. DA-33
❖ 10 - 16 May, 2026, ২৭ বৈশাখ - ২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

অমরধামে সিস্টার মেরী প্রফুল্ল, এসএমআরএ

১৯৩৫ খ্রিস্টবর্ষের ২৩ জুন পিতা গাব্রিয়েল কোড়াইয়া ও মাতা মিথিল্ডা পালমার ঘর আলোকিত করে তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর পিপ্রাশৈর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন সিস্টার প্রফুল্ল। তার বাপ্তিস্মের নাম মনিকা কোড়াইয়া। তিন বোন ও এক ভাইয়ের মধ্যে সিস্টার তৃতীয়। তার বড় বোন সিস্টার মেরী তেরেজা আমাদের সংঘের একজন সিস্টার ছিলেন। নিজ জীবনে প্রভুর আহ্বান আবিষ্কার করে তিনি ১৯৫৬ খ্রিস্টবর্ষের ৬ জুলাই "প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার সঙ্গিনী" সংঘে প্রবেশ করেন। ১৯৫৯ খ্রিস্টবর্ষের ৬ জানুয়ারি প্রথম ব্রত এবং ১৯৬৫ খ্রিস্টবর্ষের ৬ জানুয়ারি আজীবন ব্রত গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস জীবনের পূর্ণতায় তিনি ১৯৮৪ খ্রিস্টবর্ষের ৬ জানুয়ারি রজত জয়ন্তী, ২০০৯ খ্রিস্টবর্ষের ৬ জানুয়ারি সুবর্ণ জয়ন্তী এবং ২০১৯ খ্রিস্টবর্ষের ৬ জানুয়ারি হীরক জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন করেন। তিনি হলিক্রশ কলেজ থেকে এইচএসসি এবং কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে বিএসসি পাশ করেন। তিনি ২১ মার্চ, শনিবার, ২০২৬ খ্রিস্টবর্ষে মাতৃগৃহ, তুমিলিয়ার শান্তিভবনে ইহলোক ত্যাগ করে অনন্ত পিতার রাজ্যে স্থান করে নেন।

সিস্টার মেরী প্রফুল্ল একজন সুদক্ষ প্রধান শিক্ষক ও সহকারি শিক্ষক ছিলেন। ১৬৫৯ খ্রিস্টবর্ষ থেকে ১৯৯৫ খ্রিস্টবর্ষ পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে একজন আদর্শ শিক্ষিকা হিসেবে শিক্ষকতা পেশার মধ্য দিয়ে বহু শিক্ষার্থীর জীবনে শিক্ষার আলো জ্বেলে দিয়েছেন। ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৫ খ্রিস্টবর্ষ পর্যন্ত তিনি তুমিলিয়া নব্যাগৃহে সহকারি নভিস মিস্ট্রেস হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষকতা জীবন থেকে অবসর গ্রহণের পর ১৯৯৬ থেকে ২০১৪ খ্রিস্টবর্ষ পর্যন্ত তিনি সুদীর্ঘ ১৮ বছর তুমিলিয়া ও বান্দরবানে হোস্টেল পরিচালিকার কাজ, মিশনের কাজ, সিসিপি, প্রেয়ার লিডার হিসেবে সেবাদায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে প্রভুর মঙ্গলবাণী প্রচার করেন। তার সুদীর্ঘ ৬৫ বছর সেবার জীবনের প্রৈরিতিক ক্ষেত্রগুলি হলো তুমিলিয়া, রাঙ্গামাটিয়া, বনানী, মেরীহাউজ, পানজোরা, জাগরণী ও বান্দরবান।

তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিয়মানুবর্তী, মিশুকে, প্রার্থনাশীল, দরদী, পরিশ্রমী, সদালাপী, শান্তশিষ্ট, মৃদুভাষী, হাসিখুশী, সহজ-সরল, নিরবকর্মী, ধীর-স্থির, ধৈর্যশীল কষ্টসহিষ্ণু এবং স্বাস্থ্যসচেতন একজন ব্রতধারিণী ছিলেন। আর্ট-পেইন্টিং, বাগান করা, গান করা, কবিতা লেখা ও আবৃত্তি করা এবং বই পড়া ছিল তার শখের কাজ। সিস্টার তার প্রার্থনাশীল আধ্যাত্মিক জীবন ও সেবাময় কর্মজীবন দিয়ে আমাদের সংঘকে তথা সমগ্র খ্রিস্ট মণ্ডলীকে সমৃদ্ধ করেছেন। সিস্টারের জীবনের সমস্ত গুণাবলীর জন্য আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই এবং আমাদের জীবনে তা অনুকরণের কৃপা চাই। আমরা বিশ্বাস করি সিস্টার আজ তার সকল শুভ কাজের জন্য পুণ্যমণ্ডিত হয়ে পরম পিতার আবাসে তার সৌরভ ছড়াচ্ছেন এবং আমাদের জন্য মঙ্গল আশিস বর্ষণ করছেন। আমরা তার আত্মার চির শান্তি কামনা করি।

- এসএমআরএ সিস্টারগণ

বিজ্ঞ/৯৬/২৬

ছাপার জগতে এক অনন্য নাম **জেরী প্রিন্টিং প্রেস**

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org